প্রথম মুদ্রণ—১৩৬৬

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল কর্তৃক
৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯ হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকবর্গের পাঠ্যগ্রন্থরূপে 'আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হল। এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য মনঃপ্রকর্ষের কথা মনে রেখেই কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে।

এই সংকলনকে 'একালের' কবিতা সঞ্চয়নও বলা যেতে পারত। কিন্তু একালের সব কবিতাই 'আধুনিক' কবিতা নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। 'আধুনিক কাব্য'-নিবন্ধে তিনি বলেছেন, 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আধুনিক বাংলা কবিতা বিশ্বস্বীকৃতি পেল। তার অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বলাকা'। 'বলাকা'-তেই একালের আধুনিকতার সূত্রপাত। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ আবহমান কালের কবি হয়েও একালের আধুনিকোত্তম কবি।

বলাকা-প্রকাশের পর থেকে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে লেখা ষাটজন কবির একাশিটি কবিতা 'আধুনিক কবিতা সঞ্চয়নে' সংকলিত হয়েছে। নির্বাচিত কবিগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কবি, অকালপ্রয়াত সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ সালে। অর্থাৎ, এই সংকলনের কবিগণের বয়ঃসীমা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদকে স্পর্শ করেছে মাত্র। এই কালসীমার মধ্যে অন্তত দুশো-জন উল্লেখ্য কবির হাজার কয়েক সার্থক কবিতা বাংলার কাব্যসাহিত্যকে নব নব ঋদ্ধি দান করেছে। তা থেকে মাত্র একাশিটি কবিতা সংকলন করা সহজসাধ্য নয়। অপক্ষপাত কবি-নির্বাচন তো একান্তই দুঃসাধ্য। নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শুধু এটুকুই বলার আছে যে, এই গ্রন্থের স্বল্পপরিসরের কথা চিন্তা করেই, ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছা সত্ত্বেও, অনেক কবিকে সংকলনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নি।

বাংলা কবিতার সুনির্বাচিত সংকলন-গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথও 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থখানি অচিরকালের মধ্যেই অচলিত হয়ে পড়ে। উক্ত গ্রন্থে

রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব-সুন্দর 'ভূমিকা' ছিল। গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই অনবদ্য রচনাটিও লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেছে। উক্ত নিবন্ধে বাংলা কাব্যের ঋতুবদল ও রীতিবদলের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যে-সৃষ্টি প্রাণবান মনের কোনো একটিমাত্র ঋতুতে তার ফুলের শেষ ফসল অবসিত হয় না। নূতন ঋতু আসবে, নূতন রূপের বিকাশ হবে এই আশ্বাসবাণী আমাদের পাওয়া চাই, নূতন আবির্ভাবের ভালোমন্দর বিচার পাকা হোতে দেরি ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে বলে মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, ফের গ্রহণ করে আর জন্মের দেহ; তেমনি মানুষের মন এককালের সংস্কার পেরিয়ে বাঁধা পড়ে আর এককালের সংস্কারে; যাকে সে আধুনিক বলে সেও তার নতুন খোলোস, সে খোলোসও জীর্ণ হয়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমনি মোচনও করে।'

কবিগুরুর এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবিতার আস্বাদন ও বিচারবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে পারলেই সর্বকালের আধুনিকতার মর্মলোকে প্রবেশের সিংহদ্বারটি খুঁজে পাওয়া যাবে।

যাঁদের কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

কবি ও কবিতার নাম পত্রাঙ্ক

কবি ও কবিতার নাম পত্রাঙ্ক

ঝড়ের খেয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন-
-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।'

তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।
'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর'
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে: দিগন্তে ফেনায়ে ওঠে ঢেউ-
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—
'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।'

বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন-মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।'

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার,—
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,

আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসাহলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।

তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত,
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

দুঃখের দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়,
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
'তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ-সাথে যুঝে,

পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশলজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

আশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

পৃথিবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে, মহৎ জীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য, কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়—
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত:
গদা হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি;
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পরযুগে,
মন্ত্র পড়লেন দানবদলনের—
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা—
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে,
দিনে রাত্রে উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।

তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে—
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।

শুভে-অশুভে-স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয়-মুষ্টি ধূলি, আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
'আমি আনন্দিত'।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়—
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে

হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

আবার ফাল্গুনে দেখেছি, তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ আম্রমুকুলের গন্ধে।
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে স্বর্গীয় মদের ফেনা;
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার-অতীত প্রত্যুষে;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ;
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে;
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান॥

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে;
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান্ খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—

তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

রাতের গাড়ি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।
অসীম আঁধারে
কালি-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়হারা দেশে।
ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।

অতিদূর তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি,
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ॥

চালায় যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে, সে অনিশ্চিত; তবু জানে, অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি যেন বহে নিশ্বাস,--
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে॥

মধুময় পৃথিবীর ধূলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক প'রেছি ভালে;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।'

কাঁঠালী চাঁপা

প্রমথ চৌধুরী

গড়নে গহনা বটে, রঙেতে সবুজ,—
ফুলের সবর্ণ নহ, বর্ণচোরা চাঁপা!
বৃথা তব গন্ধভারে গর্বভরে কাঁপা!
ফিরেও চাহে না তোমা নয়ন অবুঝ॥
নেত্রধর্ম—খুঁজে ফেরা গোলাপ, অম্বুজ;
উপেক্ষিতা আছ তুমি, হয়ে পাতা-চাপা।
তোমার কাঁঠালী-গন্ধ নাহি রহে ছাপা,—
ছুটে আসে ভেদ করি পাতার গম্বুজ॥

ঠিক ক'রে হও নাই পাতা কিম্বা ফুল,—
দুর্মনা করাই তব দুর্গতির মূল!

পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হতে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার।
সর্বধর্মসমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ,—
স্বধর্ম হারিয়ে হলে সর্বজাতি-বার!

বার্নার্ড্ শ

প্রমথ চৌধুরী

সভ্যতার প্রিয়শত্রু, বার্নার্ড্ শ.
সমাজের তুমি দেখ শৃংখল আচার,
শিকল বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা হয় থ!

মানুষেতে ভালোবাসে হ য ব র ল,
তারি লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ পায়, যে করে বিচার—
অন্যের পায়ের নীচে প'ড়ে যায় দ!

মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাস'—
অপরে বোঝে না, তাই নাটকেতে হাস'॥

হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদ্‌ঘর্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!

মনোহারিকা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বন-ফুলের বরণ-মালা
　　পাতার কোলে দুলিয়ে রে,
বল্ রে তৃণ, বল্ আমারে
　　কোন্‌খানে সে লুকিয়েছে?
ঐ নারিকেল গাছের ঘন
　　কুঞ্জবনের আব্‌ছায়ে,
বল্ কোথা তার কুন্দমালা
　　পথের ধূলায় লুটিয়েছে?

এক্‌লাটি সে থাকত্ শুয়ে,
　　সাঁঝের আলোর ঝল্‌মলে,
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু
　　দূর্বাদলের মখ্‌মলে—
এলিয়ে দিত ফুলের বাজু
　　উজল ভুজ-বল্লরী,
কাঁটা-হারা-তরুণ-গোলাপ—
　　শাখার-মতন টল্‌মলে।

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
　　রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে,
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
　　তর্জনীতে জড়িয়েছে;
এক-মনে সে শুনতেছিল
　　কানুর গানের অন্তরা—
ব্রজ-বধূর দীর্ঘশ্বাসে
　　চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে!

সে যে আমার গানের মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী;
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে'
কোথায় সে যে লুকিয়েছে-
কত দিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী!

আইবুড়ো কালো মেয়ে

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সন্ধ্যা-আকাশে নীরবে তখন আঁধার আসিছে ছেয়ে;—
দাওয়ার উপরে ছায়ার মতন বসে' আছে কা'লা মেয়ে।
বিরলবসতি ছোট গৃহখানি, গোটা দুই কোঠা-ঘর;
অদূরে তাহারি বহিছে 'তুফানী', সম্মুখে বালুচর।

পল্লীর গৃহ—শান্ত রজনী, সাঙ্গ যা-কিছু কাজ,
ডাকিল জননী—উঠে আয় ননী, চুল বাঁধবিনে আজ?
চোরের মতন মেয়ে উঠে' এসে বসিল মায়ের ডাকে,—
কথা যাহা কিছু—চিরুনি ও কেশে, দোঁহে চুপ করে' থাকে!

বেড়ে ওঠে রাত—দ্বিতীয় প্রহর; চৌকিদারের সাড়া;
গরীবের বাড়ি—বিধবার ঘর—দিয়ে যায় কড়া-নাড়া;

শিয়ালের ডাক মিলাইয়া আসে ঝাউডাঙা বালুচরে,
দুইটি শয্যা পড়ে পাশাপাশি নিশীথ-নীরব ঘরে।

জানালার পাশে শন্ শন্ করি' সাড়া দেয় শালবনী,
মা শুধায় শেষে—যেন সে গুমরি'—ঘুম এল নাক ননী?
উত্তর-আশে চাপা নিঃশ্বাসে কণ্ঠ যে আসে ছেয়ে—
চেয়ে রহে তাই অন্ধ আকাশে—আইবুড়ো কালো মেয়ে।

থম থম করে গভীর রাত্রি প্রদীপ-নেবানো ঘরে,
আঁধার-পথের যুগল-যাত্রী তুফানীর বালুচরে।
একের যাত্রা শেষ হয়ে আসে, অন্যের যবে শুরু;
কালের কপালে কোন্ পরিহাস কাঁপে দুটি কালো ভুরু।

একে কালো মেয়ে, দরিদ্র তায়, বয়স—সে বিশ-পার
জগতের চোখে কে-বা তারে চায়? নিরুপায় চারিধার।
তবু এ রজনী শেষ হয়ে যাবে—যতই ফাটুক বুক!
কাল প্রাতে কোথা নিস্তার পাবে? দেখাতে হবে না মুখ:

পদ্মার প্রতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী—
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরদৃপ্ত, চির অব্যাহত।
দুর্ণমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর।

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য-সম্ভার।
উর্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি'।

অন্তহীন মূর্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সংগীতে
ঝঙ্কারিয়া রুদ্রবীণা,- মিলাইছ ভৈরবে ললিতে।
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর:
দুর্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্ঞেয় সুদূর।

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্বার
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার।
স্বর্গ হ'তে অবতরি' ধেয়ে চলে' এলে এলোকেশে
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে।

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ.
আর্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহূত—অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি।

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্যয় প্রলয়ের কাজে!
দম্ভ যবে মূর্তি ধরি' স্তম্ভ ও গম্বুজে দিন রাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন; সিন্ধুসখী! হে সাম্যবাদিনী।
মূর্খে বলে কীর্তিনাশা, হে কোপনা, কল্লোলনাদিনী।
ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে.

যা জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে.
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক বস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা! অযি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী।

জাতির পাঁতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,

বামন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র,
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি .
উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
রচিয়া মনের পান্থশালা.
কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি।
জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের ভেদ উঠেছে ধ্বনিয়া;
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে।
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি.
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
অমেয় শকতি মোদের আজি!
আজি নির্মোক মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।

পরিবর্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে!
গোত্র-দেবতা গর্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,
আর দুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি!
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্মে
মনুর ধর্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির-স্রোতে,
জগতের যত তূর্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।
ভোর হ'য়ে এল ওগো! আঁখি মেল
পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহ রে জয়—
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

বন্যা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি ভালোবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান,
কলকল্লোল-নির্ঘোষে পাই অকূলের আহ্বান।
চৌদিকে ঐ ছলছল করা গৈরিক-গলা জল,
উন্মাদনার একি উৎসব! প্রাণ করে চঞ্চল।
ভাবের বন্যা প্রাণের বন্যা উদ্দাম আলোড়ন,--
এলো ভাসন্ত ভরা বসন্ত, দুরন্ত যৌবন।
দুকূল-ভাসানো অকূল পাথার উচ্ছ্বাস ব'হে যায়,
নব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রতি জলকণিকায়।

ফণা প্রসারিয়া চলে অনন্ত, ভীম তরঙ্গ নাচে,
গ্রীক সেনা লয়ে দর্পে আলেকজাণ্ডার ছুটিয়াছে!
এসেছে পাহাড়ী বন্যা, এসেছে বন্যা ভুবনজোড়া,
চলে তৈমুরলঙের বাহিনী ছুটাইয়া লালঘোড়া!
শত গৈরিক পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝার মত আসে
শিবাজীর চতুরঙ্গ বাহিনী ভৈরব উল্লাসে!
ভেসে যায় কত, ডুবে যায় কত, গ'লে যায় কত কি যে,
জলবাজ্যের ওয়াটারলু ও জেনা অস্টারলিজে।

বহিতেছে স্রোত যুগের যুগের কর্মধারার মত,
তার সৃষ্টির, তার কৃষ্টির ভঙ্গিমা হেরি কত।
কি প্রচণ্ডতা! মিলিছে কতই শক্তি অলৌকিক-
কতই আর্য, কত অনার্য গথিক টিউটনিক!
কত পিরামিড, কতই স্ফিনিক্‌স্‌ ভাঙে গড়ে বার বার,
ক্ষণে উত্থান ক্ষণেই পতন লক্ষ হারাপ্পার।
হয়তো এতেই 'নোয়া'র আর্কের পেতে পারি সন্ধান।
বটপল্লবে এতেই কোথাও ভেসেছেন ভগবান।

এমনি বন্যা এসেছে লক্ষ ভিক্ষু শ্রমণ সাথে
কপিলবাস্তু, তক্ষশীলা ও নালন্দা সারনাথে।
এমনি প্লাবন আনিল আবার শঙ্কর জটাজাল
চৌদিকে রচি' দুর্জয় মঠ, মন্দির সুবিশাল।
নূতন বন্যা আবার ডুবালো নদীয়া শান্তিপুর-
রাঙাইয়া মন, রাঙাইয়া বন ব'হে গেল দূর দূর।
ভালোবাসি বান, দেখিয়া আমার তৃপ্তি মানে না হিয়া-
জগন্নাথের রথের আগে এ গেরুয়া কীর্তনীয়া।

উড়ো চিঠি

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

কে পাঠালে উড়ো চিঠি
বসন্তের এই রঙীন হাওয়ায়
ও ফুলেরা জানিস তোরা
কোনখানে সে কোন ঠিকানায়?
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভাল আছে জানা,
বকুল বলে—না না না না
কাজ কি গোলাপ পরের কথায়।

চামেলি তুই বলতে পারিস?
চামেলি কয় মুচকে হেসে-
কেন তোমায় বলব আমি?
ছিল আমার সখি যে সে!
পারুল বলে—আকাশ পারে,

কামিনী কয়—নারে নারে,
ও জানে না জানে তারে
চাঁপা সে ঐ লুকিয়ে পাতায়।

চাঁপা বলে—কথা আমি
কইব নাকো তোমার সনে,
মানুষগুলো এমনি খেলো
কিচ্ছু কি তার রয় না মনে?
আমি তো কই যাইনি ভুলে
সেই কালো সেই রেশমী চুলে,
নরম নরম দু আঙুলে
আমায় তুলে পোরতো খোঁপায়।

ভোরের আকাশ—কওনা কথা,
ফুলেরা ত সবাই মিলে
একটা কথার জবাবেতে
লক্ষ কথা শুনিয়ে দিলে!
আর যাব না ফুলের বনে
বৃথা তাহার অন্বেষণে,
এত দেমাক ফুলের মনে!
ফুলের এত দেমাক মানায়?

মুখের পানে চেয়ে চেয়ে
উঠলো বলে—ভোরের আকাশ—
সময় আমার নেইক এখন,
কথা কবার নেই অবকাশ।
এমনি আমার ক্ষণিক জীবন
ঘনিয়ে দ্যাখো আসচে মরণ
আমার গালের গোলাপ বরণ
পাল্টাতে চোখ ঐ গো পালায়!

সাঁঝের তারা সাঁঝের তারা—
তুমি কি ভাই বলতে পারো
হাওয়ার হরফ দিয়ে লেখা
উড়ে এলো চিঠি কার ও?
লাগচে চমক হৃদয় মাঝে,
পড়চে বাধা সকল কাজে,
উড়িয়ে নিয়ে মনখানা যে
কোন সুদূরে ভাসিয়ে নে যায়!

সাঁঝের তারা মৌন মুখে
রইল চেয়ে মুখের পানে,
স্থির অপলক দৃষ্টি তাহার
মগ্ন যেন কিসের ধ্যানে!
চাঁদের আলো তোমায় তবে
ঐ কথাটি বলতে হবে;
চাঁদের আলোও রয় নীরবে
এলিয়ে পড়ে ঝিমিয়ে নেশায়!

ঝিঁঝিঁর পাঁজর বাজিয়ে পায়ে
আঁচল বায়ে নিবিয়ে বাতি
কে এলো রে? কে এলো রে?—
নিঝুম রাতি—নিঝুম রাতি!
বল্লে—ক্ষ্যাপা এই আঁধারে
খুঁজে খুঁজে মরিস কারে!
সে যে নদীর অপর পারে
রয়েছে তোর আশায় আশায়!

দুখবাদী

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তা'রই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তা'রই পরে তব কোপ,
যে-জন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ্।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল।
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে বসে' গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান।
দিগন্ত পারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
বজ্রে যে-জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ্ সে বংশে কেবা করে?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে।
ফাল্গুনে হেরি নব কিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি:
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী!

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু তুমি ত জান',
একা বসে' যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো।
জমাখরচের কৈফ্যৎ কেটে বাকী যে ফাজিল কত,

বাহিরে 'বিজ্ঞাপনে' যাই বল,—অন্তরে বুঝিছ ত!
বজায় থাকিতে খ্যাতি,—
সহসা জ্বালাবে কোন্ সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি।
সুখে মোড়া দুখে ভরা কতবড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।
সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো বোলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।
চটক বা চখা কি জানে প্রেমের? বকে কি শিখাবে ধর্ম
সহজ-স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন-মর্ম।
অরণ্যতরু জপিছে অন্ধ ঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম।
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা থোবে রঙিন বারাঙ্গনা—
খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়ঋতু-ছলে, ষড়রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য।
ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার
এ যদি বন্ধু, হয় তব ছায়া, কায়া ত চমৎকার!

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া র'য়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি।
সৃষ্টির সুখে মহাখুসি যারা, তারা নর নহে জড়,
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ!

সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।

কচি ডাব

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব?'
আমার বাসার ধারে
হাঁকে বৃদ্ধ ঝাঁকা ঘাড়ে,
সে পথে তখন লোকাভাব।

অঘ্রাণের শীত-সন্ধ্যা
শ্বাসরোধী ধূম্রগন্ধা
চাপিয়াছে শহরের বুকে,
হিমাঙ্গ উত্তর বায়
হাঁপের টানের প্রায়
থেকে থেকে গলিটায় ফুঁকে:

হাঁকে বৃদ্ধ 'ডাব, কচি ডাব?'
পাগল! আজি এ সাঁঝে
সংকীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব;—
সেইখানে এই শীতে
কি বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব?

কাঁদিয়া কহিল বুড়া—
'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা
মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও।

বাহিরিয়া দ্বার খুলি'
দু'হাত ঝাঁকায় তুলি'
নামাইয়া দিনু তার ভার
ব'সে পড়ি ভাঙা ধাপে
থর থর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

ক্ষণেক নীরব থাকি'
ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি'
কহে বৃদ্ধ তবে বাবু যাই
ডাব ক'টি নামাইয়া
ন্যায্য দাম হাতে দিয়া
আমি তার মুখপানে চাই।

গণ্ড ভরি' আঁখি-নীরে
খালি ঝাঁকা তুলি' শিরে
গলি বেয়ে চলি গেল বুড়া.
ঘরে ঢুকি দ্বার রুধি'
অন্ধকারে চক্ষু মুদি'
কোলে তুলে নিয়ে তানপুরা.

বেসুরে ধরিনু গান,—
হায়, হত ভগবান্!
মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ!

অপরের কাব্য ভালে
মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত-না সুযোগ।

সে-সব কবির বেলা,
শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পসারিণী
তনুদেহে সিক্ত বাস,
নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।

আরো ভাগ্যবান যিনি
আসে তাঁর পসারিণী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়
শয্যা শুভ্র ফেননিভ
স্বহস্তে পাতিয়া দিব'
সাধে কবি সমবেদনায়।

এ ভালে তেঁতুল-গোলা
অতি বৃদ্ধ ডাবওলা।
তাও নহে বৈশাখী দুপুরে
মিটাতে প্রাক্তন দেনা
শীতরাত্রে ডাব কেনা।
তাই কি কাটারি আছে ঘরে?

সহসা ঝনাক্ ঝান্
তানপুরে কাটে তান,
ছিঁড়ে গেল সব কটা তার.
আমার শ্রবণ-মূলে
অকস্মাৎ গেল দুলে'
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার।

দারুণ শীতের সাঁঝ,
হে আমার নটরাজ,
কোন রূপে এসেছিলে দ্বারে?
অশ্রুর সাগর-মন্থ
হে আমার নীলকণ্ঠ!
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে।

শীতাতপে দিগম্বর,
দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায়,
অন্তর-শ্মশানে চিতা
সারি সারি নির্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা,
শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।
কৃষ্ণাচতুর্দশী-শেষে
তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা!

তোমার মাথার ভার,
ধরেছি যে একবার,
তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।
দিয়েছি তামার চাকি,—
সে মোর হয়নি ফাঁকি,
সোনায় ঘটিত অপরাধ।

যে মোহিনী স্বর্ণটাটে
পাতে পাতে সুধা বাঁটে,
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,

হে মোর বঞ্চিতরাজ,
নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা।

তাই তুমি নানা ছলে
আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙ্গিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আস,
কাঁদি ব'লে ভালবাস,
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়

তোমার প্রসাদকামী
স্বগৃহে সন্ন্যাসী আমি,
এ জীবন নিষ্ফলে সফল-
অনাদি দুঃখের স্রোতে
তোমারি নয়ন হ'তে
ঝরে'-পড়া একফোঁটা জল।

ব্যথার আরতি

মোহিতলাল মজুমদার

যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা।
এই অবনীর বেদনা-নিবিড় সবুজ অন্ধকারে
পথ ভুলি বারে-বারে,
কণ্টকে ফোটে রক্ত কুসুম বাসনা-সুরভি-ঢালা!

যত দিন যায়, আঁখি না জুড়ায়—অশ্রুর পারাবার
পূর্ণ-প্রাণের পূর্ণিমা-রাতে উথলিছে অনিবার!
ওই গগনের নিশীথ-নীরব নীলিমার কূলে-কূলে
দীপ উঠে দুলে' দুলে'
তারি পানে চেয়ে সোনা মনে হয় মৃণ্ময় সংসার।

যত সে কাঁদায় তত বুকে বাঁধি, তত তারে ভালোবাসি
ধরণীর এই শ্যামমুখখানি, আঁধার অলক রাশি।
ভয়ের স্বপন এত দেখি, তবু চাহি না ত, নিশি ভোর,
ভাঙে না যে ঘুম-ঘোর।
ভুলে পড়ি যবে বিষ-হাসি হাসে রূপসী সর্বনাশী।

জীবনের নিশা জ্যোৎস্নায় ভরে মৃত্যুর ম্লান প্রাতে
মরম মুরজ মুরছিয়া বাজে নির্মম করাঘাতে।
হারাই যাহারে তারি তরে হিয়া আরো করে হায় হায়
স্মৃতি-সুখ উথলায়।
মরণের ডালা সাজাইয়া ধরি অমরণ ফুলপাতে।

হাহা করে হাওয়া, দীপ নিবে যায়, সাথীহীন অমারাতি;
বাহিরে বিজনে হাস্নুহানায় জ্বলিছে জোনাকি-পাঁতি।
সে মহাশূন্য ভরি' ওঠে মোর নিরাশার উল্লাসে,
—কেঁদে উঠি কলহাসে।
আঁধার নয়নে চমকিয়া ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি।

যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা।
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা।
আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপাসা, এ দেহ পুড়িতে চাই।
সুখ দুখ ভুলে যাই।
বুঝিয়াছি কেন কুলে কালি দেয় তোমা' লাগি' কুলবালা।

পয়ার

মোহিতলাল মজুমদার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী।
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরু-ধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে
যে-বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী।

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে,
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে!
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা?—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে।

কবির বিদায়

কালিদাস রায়

বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি-যুঁইয়ের বনে,
বিদায় নিল সজল চোখে ন'বসন্তের ক'নে।
বিদায় নিল কাঁচপোকা-টিপ, নয়নে কাজল,
নাকটি হ'তে নোলক-মোতি, চরণ হতে মল।

বিদায় নিল লালপেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর—
সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর,
সুবাস-ভরা টেক্কা-খোঁপার চারু-চিকন ছবি,—
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

বিদায় নিল টুকটুকে সেই আল্‌তা-রাঙা পা,
বিদায় নিল সর-বেশনে গামছা-মাজা গা'।
বিদায় নিল আয়ুষ্মতীর লোহা-সিঁদুর-শাঁখা,
পথের বাঁকে কলসী-কাঁখে পিছন ফিরে থাকা,
রাঙা ঠোঁটে শাঁখ-বাজানো, এয়োর হুলুধ্বনি।
বিদায় নিল দীঘির-ঘাটের চটুল আলাপনী;
চাকায় সিঁদুর উড়িয়ে যখন নিচ্ছে বিদায় রবি,
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

বিদায় নিল অন্নদা-মা'র অন্নভরা থালা,
পান সুপারির নিছনি আর শুভ-বরণ-ডালা।
বিদায় নিল সেবাব্রতার ভালে স্বেদের কণা,
বিদায় নিল লক্ষ্মীমায়ের চরণ-আলিপনা।
বিদায় নিল পিতল-কাঁসায় সোনা-রূপার প্রভা,
চাঁদনী-সাঁঝে আঙনমাঝে উপকথার সভা।
বিদায় নিল সচন্দনা তুলসী, জাহ্নবী,—
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

বিদায় নিল খুল্লনা-মা'র চণ্ডীদেবীর ঘট,
শেজ-শিয়রে ভিতের-গায়ে কালী-মায়ের পট।
ধান-দূর্বার আশিস্ গেল—মায়ের হাতের ফোঁটা,
হৃৎকমলের পাপড়ি গেল, রইল শুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেল, নির্ভয়ে দিল ঝড়
সাধ্বী-সতীর আঁচল-আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যাহা পুঁজি-পাটা বিদায় নিল সবি—
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

সুশীলকুমার দে

চিনিলে না তারে, তাই চলে গেল,--তবু কেন বারে-বারে
অজানার ব্যথা নিগূঢ় আঘাত করে মর্মের দ্বারে?
যা' কিছু রম্য, যা'-কিছু মধুর
ভরে কেন আজ হৃদয় বিধুর?
শত জনমের চির-বিস্মৃত পরিচয় বুঝি তারে
বিহ্বল করে ভাব-সুনিবিড় বেদনার হাহাকারে।

যে-নয়ন তুমি ফিরালে সে দিন হাসি' অবজ্ঞাভরে
সে নয়নে আজ আঁধার নেমেছে, অবিরল ধারা ঝরে,
অকরুণ তুমি দেখনি সেদিন
মুখখানি মূক দুঃখ-মলিন,
আঁখির পক্ষ্ম মণ্ডিত নিবিড় অশ্রুর নির্ঝরে,
তাই চোখে তব সেই নির্ঝর, মুখে কথা নাহি সরে।

স্মৃতির শিখায় প্রীতির প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করি
অবোধ হৃদয় আশ্বাস মাগে অদৃশ্য পায়ে পড়ি'।
অনাদরে ঝরি মুকুল মিলায়,
তবু অগোচর গন্ধ বিলায়,
অঙ্গুরী তার ফিরে এলো, তবু কোথা সেই সুন্দরী?
শুধু নাম জপি' কাটে না ত আর বিরহের বিভাবরী।

তাই রূপরস-পরশ মাগিয়া বিরহের তীরে-তীরে
অনঙ্গ আজ অঙ্গের লাগি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে।
দেহের গেহটি বেড়িয়া অপার
বিদেহ বাসনা করে হাহাকার:
ফুলকুন্তলা শকুন্তলা সে জাগে আজ আঁখিনীরে
একবেণীধরা পাণ্ডু-অধরা বিরহের মন্দিরে।

কোন তপোবনে আবার তাহার হেরিবে সে-মুখখানি
পরিহরি' সব বাসনা-দম্ভ নিজেরে ধন্য মানি'.
অধরে রবে না রোষের স্ফুরণ,
জলে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ নয়ন,
শুধু দুজনার হৃদয় দু'জনে কবে ল'বে সন্ধান' ?
মর্ত্যের প্রিয়া হবে কি আবার স্বর্গের কল্যাণী ?

দু'জনার বুঝি ভাব-বন্ধন আবার নূতন ক'রে'
বাঁধিবে ক্ষুদ্র দু'টি শিশুকের পরশের রসে ভরি
দু'জনে চুমিয়া সে-মুখকমল
হবে দু'জনার নয়ন সজল,
শিশু-অঙ্গের ধুলোর পরশ আপন অঙ্গে ধরি',
পরিণত হবে শরতের ফলে বসন্ত-মঞ্জরী।

খরানি

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এমন নধর ধানের 'জ্যাওলা' খরানিতে গেল পুড়ে
বড়বাবু ঠিক খাজনার দায়ে বেচে নেবে ভাঙা কুঁড়ে!
এক ফোঁটা জল দিলে না দেবতা চাষার কপাল পোড়া.
ধানের ফলন দেখে মরে যাই, যেন গো বাঁশের 'কোঁড়া'।
কোনটীর শিরে শিষ ধরে আছে কোনটীর বুকে ধান.
সব মরে গেল বর্ষা অভাবে তবু ভাল ছিল বান!
'ফুলমুখী' হ'য়ে কোনটী শুকায়, 'দুধে ধান' কারো-মাথে,
দিও দিও দেয়া একটি পশলা আজকে আধেক রাতে।
দেহ মাটি করে যে ধান বুনেছি সে ধান মরিয়া যায়,
বুকের রক্ত মুখে তুলে চাষ, চাষা মরে যাবে হায়!

দশ বিঘে ভুঁই শুধু ধান মোর বুক ফেটে যায় দেখে
রোদ্দুরে অই চিক্ চিক্ করে বায়ু ভরে থেকে থেকে
মোটা ডাঁটা আর লকলকে শিষ 'দাপানে জ্যাওলা' মোর,
ছিরি দেখে চোখ ফিরাইতে নারি এ-যে মুস্কিল ঘোর।
স্যাকরা বাড়ী যে দিয়েছি বায়না পাতানীর সাতনলী,
ধান বিনে মান রবে না আমার একথা সত্য বলি।
আমরা নাঙলা-চাষা তাই ওগো দেব্তা ধিইয়ে থাকি
এ ধান খরিয়ে যদি মরে যায় কি আর রইবে বাকি।
দুলুরে বলেছি 'বুলুদেয়া সাড়ী' আশ্বিনে দেব কিনে
থাক্‌গে সে সব,—কেমনে পরাণ বাঁচিবে অন্নবিনে।
মোরা নির্বোধ চাষা তাই বুঝি দেবতা বিমুখ রবে
দেবতা মানুষে এত অবিচার, কেমনে কাঙাল সবে?

ঝিনুক

কৃষ্ণধন দে

রঙিন ঝিনুক এক সাগরের ঢেউ দিল ছুঁড়ে
আমার পায়ের কাছে, তুলে দেখি সারাদেহ জুড়ে
কত হিজিবিজি লেখা, আঁকাবাঁকা রঙের আলপনা,
--অজানা রহস্যলিপি, সাগরের অস্ফুট কামনা।

সুদূর অতীত থেকে ফিরে এল একটি আকাশ,
অজানা বনের গন্ধ, সাগরের ঢেউয়ের নিশ্বাস,
সৃষ্টির ক্রীড়ার স্বপ্নে কবে কার ভরেছিল মন,
কি লেখা লিখতে যেন চিরদিন কার আকিঞ্চন।
আদিম ঊষায় সে যে পেতেছিল তার খেলাঘর,
রঙ দিয়ে আল্‌পনা দিয়েছে সে ঝিনুকের 'পর,

তারপর কত স্বপ্ন, ভাঙাগড়া, কত দুঃখসুখ—
এখনো ভোলে নি সে যে খেলাচ্ছলে তার সে কৌতুক!

রঙিন ঝিনুক হাতে সাগরের পানে রই চেয়ে,
খেলাঘরে খেলে যেন আজো সেই পুরাতনী মেয়ে!

দারিদ্র্য

কাজী নজরুল ইসলাম

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা!—দিয়াছ, তাপস,
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার!

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যত বার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!

বেদনা হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম!
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির সজল

টলটল ধরণীর মত করুণায়'
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়'
করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হ'য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল
জ্বালা নাই নেশা নাই নাই উন্মাদনা
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে'
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা'
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা'

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক,—মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে আছে দুঃখ আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ!'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি'

চল—পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু' নয়ন ভরি রুদ্র হান অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,

প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সংকোচ সরম বলি জাননাক' কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষ্মীর কিরীট ধরি ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে! বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী?
যত সুর আর্তনাদ হ'য়ে ওঠে শুনি।

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া'!
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে! সখি বলে, বল্
মুছিলি কেন লো আঁখি মুছিলি কাজল?

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি!
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়

চুম্বনে বিবশ করি'! ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পুরে' আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে!
পুষ্পাঞ্জলি ভ'রি দু'টি মাটী-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!
সহসা চমকি উঠি! হ'য়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনিক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস!

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই কিছু নাই।

জীবন-বন্দনা

কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে ফলে!
বন্য শ্বাপদ-সংকুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হ'ল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্ব্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী ল'য়ে।
এল দুর্জ্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু

তারাই গাহিল নব প্রেমগান ধরণী-মেরীর যীশু
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মতো ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে।

খেয়াল-খুশিতে কাটি' অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংসসাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,
নবীন আবেগ রুধিতে না পারি' যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্দ্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র মঙ্গল গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মরু-কবি—গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ ক'রে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে।

আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোনো বাধা মানিল না,
বর্ব্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপমণ্ডুক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই, গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে!

মৃত্যুর আগে

জীবনানন্দ দাশ

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুলে
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে,

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার ·
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ;—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো'
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা: অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক,
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ·

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;

শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে.

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে.
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল.
পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে;—আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো-এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির :
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর.

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানিনা কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ: একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়;—যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

জীবনানন্দ দাশ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে,
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছি'লেন
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

ভীমসেন

বনফুল

চালাতেছে গদাযুদ্ধ পরাক্রান্ত বীর ভীমসেন
রক্তচক্ষু, স্ফীতনাসা, তুঙ্গশির, ভীষণবদন
হুহুঙ্কারি উচ্চকণ্ঠে দুর্যোধনে ডাকি কহিলেন,
'রে দুরাত্মা, আজ তোরে পাঠাইব শমনসদন,
সাধ্য থাকে রোধ কর।' সচকিত গান্ধারী-কুমার
বাঁচাইল কোনক্রমে শির। 'সাধ আছে সমরের?'
দন্ত কড়মড়ি ভীম হানিলেন গদা পুনর্বার।
সে আঘাতও, কী আশ্চর্য, দুর্যোধন রোধিলেন ফের।

ক্ষুব্ধ এল ভীম-গুম্ফ। বৃকোদরে অপমান হেন
সহসা তুলিয়া গদা উল্লম্ফিয়া ছাড়ি অট্টনাদ
মহাক্রোধে ক্ষিপ্ত ভীম করিলেন গদা-বৃষ্টি যেন।
পেটে পিঠে বুকে মুখে—রহিল না কোনোখানে বাদ।
কী মুশকিল, যাত্রা এটা, কী আপদ, ওরে শোন শোন
আর্তকণ্ঠে নিবেদিল ভূপাতিত ভীত দুর্যোধন।

রবীন্দ্রনাথ

সজনীকান্ত দাস

হিমালয়
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,

যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র হস্তী বরাহ বন্য ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায় তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ,
অসীম শূন্যে হিমে ঢাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
আপনার প্রেমে তিলে তিলে হিম হয়েছে বুকের তাপ—
মাটির উপরে দাঁড়ায়ে রয়েছে, সে কথা গিয়েছে ভুলে।
অতল নিম্নে গুহা-অরণ্য শ্বাপদ ভ্রমিয়া ফিরে,
সাপেরা চলিছে বুকে পেটে করি ভর—
বিচিত্র কত নরনারী, আর পোষমানা পশু কত,
ঘোড়া ও কুকুর, ছাগল, ভেড়ার পাল,
তারই আশ্রয়ে রয়েছে তবুও তাহা হতে কত দূর!
ভয় করি আর শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধব্ ধব্ করে—
নিম্নে গুহায় কুহেলি অন্ধকার;
ঊর্ধ্ব শিখরে ধূধূ করে হিম-মরু,
নাহিক পাদপ, নাহি পল্লব ছায়া—
নীচে অরণ্য, রৌদ্রকিরণ পশে না ছিদ্রপথে,
ঘননিবিষ্ট তরু ও গুল্ম মেলেছে অযুতবাহু—
নাহি মানুষের পায়ের চিহ্নে আঁকা ক্ষীণ পথরেখা
সারা বনভূমি রবিকরলেশহীন।

দূরে হতে আসি, হিমে ঢাকা শির চকিতে ঝলসি উঠে,
অনাদিকালের বৃদ্ধ যেন রে বসে আছে পাকা চুলে—
ঝলসে তুষার, যেন বৃদ্ধের হা হা হা অট্টহাসি;
ব্যাকুল হৃদয় আজিও পেল না নরম মাটির ছোঁয়া—
তুষারাবরণে আহত হইয়া ফিরি—
ক্ষোভে কেঁদে ফেলি, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে
সম্মুখে আমার সবজির ক্ষেত তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরণা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরি ঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে
কোথা হিমালয় হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে চেয়ে
ঢেউ গণি আর শুনি কুলুকুলু রব,
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে কোরো না হিম।
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সবজি ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি ত রাখিব না'ক;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—

কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিহাস তার যে পারে রাখুক লিখে—
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই পুলকে ফিরিয়া আসি।

শাশ্বতী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা॥

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,

চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী,
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে,
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে॥

সান্ধ্যলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে :
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে,
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি;
স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম;
কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না॥

উটপাখী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধু ধু করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পলাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনও বিপদ্‌প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনও নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা;
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটিতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি,
শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙেখ পুঙেখ খুঁজব না অমারাতে।
তোমার নির্বিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে,
সে পাড়া-জুড়নো বুল্‌বুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উন্‌তিরিশে॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি॥

সংগতি

অমিয় চক্রবর্তী

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরোজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুরে ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গী-হারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা।
প্রাণ নেই তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচিয়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন॥

দিনযাপন

অমিয় চক্রবর্তী

সামনে ছায়াচক্র মেলে
ঝাউ আছে চেয়ে
রোদ্দুর পোহায়।
ভাবা নেই, হওয়া আছে, কী হওয়া জানে না
কেই বা তা জানে,
নীল শামিয়ানা স্বচ্ছ, কম্পিত সীমায়
মেঘ-লাগা বায়ু
তাই ছুঁয়ে আরো বেশি ঝাউ হওয়া।
মাটির আকর্ষ, মজ্জা, মাটির শিকড়,
তরঙ্গিত তন্দ্রাবেগ তারি দোলে ঊর্ধ্বে জাগা
বৃক্ষ ধারণায়,

স্বর্ণশ্যাম পুষ্পপত্র বনের কিংখাবে
ঋজু ঝাউ ছায়াচক্র মেলে চেয়ে আছে॥

বাঁকা ডাল সেও ঝাউ, পাতা ঝাউ
ঝিরিঝিরি সমীরিত,
বৃন্ত ফল শুষ্ক ঝরা ঝাউ,
পাখি-ওড়া আশমানি বাঁশি-বাজা দূরে,
ফাগুনে চাঁদনি রাত, মৌসুমী শ্রাবণ
ঝলমল, ঝরঝর, স্তব্ধ ঝাউ।
নিপুণ তারার জালে শাখার বিন্যাস,
অন্ধকারে ঝিল্লিপাড়ে গাঁথা ঝাউ
সমাহিত॥

কাঁসারি শাঁখারি গ্রামে, ধুনুরি তাঁতির
কাজে ভবা কত শব্দ, খায় খিলি-পান
বাজারিরা হাটে ঘরে, গল্পের কিনারে
ধীরে-ধীরে গাঢ় বেলা, ম্লান আলো
দিনের খিলানে;
সমস্ত আকাশ ধুনো গোধূলিতে
তিসি তিল কচি ধান ঘুঁটে-পোড়া ধুলো ওঠা
এক ধোঁয়া;
বন-ঝাউ ছিল প্রতিবেশী—
কাঠ তার তক্তা হ'ল, ডাল কাটা পুড়বে উনোনে,
হঠাৎ সহস্র দিন শেষ যেন এক লহমায়,
মিশ্র সন্ধ্যারাত্রি আজ ছায়াসাক্ষ্যহীন।
খোয়াই খয়ের রঙ, রাঙা দিগ্বলয়
চতুর্দিকে নবজাত বৃক্ষের সমাজ॥

কুড়ানি

মণীশ ঘটক

১

স্ফীত নাসারন্ধ্র, দু'টি ঠোঁট ফোলে রোষে,
নয়নে আগুন ঝলে। তর্জিলা আক্রোশে
অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া,
"খট্টাইশ, বান্দর, তরে করুম না বিয়া।"

এর চেয়ে মর্মান্তিক গুরুদণ্ডভার
সেদিন অতীত ছিল ধ্যানধারণার।
কুড়ানি তাহার নাম, দু'চোখ ডাগর
এলোকেশ মুঠে ধরি, দিলাম থাপড়।
রহিল উদ্গত অশ্রু স্থির অচঞ্চল,
পড়িল না এক ফোঁটা। বাজাইয়া মল
যায় চলি; স্বগত, সক্ষোভে কহিলাম
"যা গিয়া! একাই খামু জাম, সব্রি-আম।"

গলিতাশ্রু হাস্যমুখী কহে হাত ধরি,
"তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্দরী!"

২

পঞ্চদশী গৌরী আজ, দিঠিতে তাহার
নেমেছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার।
অনভ্যস্ত সমুদ্ধত লাবণি প্রকাশে
বিপর্যস্তদেহা তন্বী; অধরোষ্ঠ পাশে
রহস্যে কৌতুকে মেশা হাসির আবীর
সুদূর করেছে তারে—করেছে নিবিড়।
সান্নিধ্য সুদুর্লভ, তবুও সদাই

এ-ছুতা ও-ছুতা করি বিক্ষোভ মেটাই
গাছের ডালেতে মাখি কাঁঠালের আঠা
কখনো-সখনো ধরি শালিক টিয়াটা।
কুড়ানিকে দিতে গেলে করে প্রত্যাখ্যান,
"আমি কি অহনো আছি কচি পোলাপান!"

অভিমানে ভরে বুক। পারি না কসাতে
সেদিনের মত চড়, অথবা শাসাতে॥

৩

ছুটিতে ফিরিলে দেশে কুড়ানি-জননী
আশীর্বাদ বরষিয়া ক'ন--"শোন্ মনি,
কুরানি উন্নিশে পরে, আর রাহি কত?
হইয়া উঠতেয়াছে মাইয়া পাহার পর্বত।"
"সুপাত্র দেহুম" কহি দিলাম আশ্বাস
চোরাচোখে মিলিল না দরশ আভাস।
ম্লানমুখ, নতশির, ফিরি ভাঙা বুকে,
হঠাৎ শুনিনু হাসি। তীক্ষ্ম সকৌতুকে
কে কহিছে,—"মা তোমার বুদ্ধি ত জবর।
নিজের বৌয়ের লাইগা কে বিসরায় বর?"

সহসা থামিয়া গেল সৌর আবর্তন,
সহসা সহস্র পক্ষী তুলিল গুঞ্জন!
সহসা দক্ষিণা বায়ু শাখা দুলাইয়া
সবক'টি চাঁপা ফুল দিল ফুটাইয়া॥

বনস্থলী

প্রমথনাথ বিশী

আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়।
সরল শাল্মলী শাল
বাল্মীকির অনুষ্টুপ্ প্রায়,
বিস্তারিত বটচ্ছায়া রচেছে অধ্যায়
বনপর্ব মহাভারতের,
এর
গলিতে গলিতে
ছায়ানট বৃক্ষরাজি লতার ললিতে
মিশেছে অপূর্ব রাগে;
ফাল্গুনের আগে
বনের নির্মোক খসে পাতায় পাতায়,
তরুর মাথায়
কুসুমের পূর্বরাগ রক্ত কিশলয়ে,
বেদনার লয়ে
আসে তপ্ত মধ্যাহ্ন পবন,
চুরি ক'রে নিয়ে যায় বনশ্রীর মন
কোন দূরান্তের পানে,
তন্দ্রাহীন গানে
নন্দনের শেখা সুর সাধে বসে একা
সঙ্গিহীন পিক;
দশদিক্
উঠি মর্মরিয়া
পুরূরবা-হতাশ্বাস দেয় বিস্তারিয়া।

আজি শীত-মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরে
সুখস্বপ্ন ভরে

আমীলিত নেত্র ধরণীর;
শুধু ধীর
জপমাল্য আবর্তন ঘুঘুর বিলাপে;
দিঙমণ্ডল কাঁপে
প্রচণ্ড ব্যথায়;
টুপ টাপ্ শব্দ শুনি স্খলিত পাতায়,
বিশ্বের সঙ্গীত যেন ফল্গুরূপ ধরি
গেছে কোথা সরি,
শুধু দু'এক অঞ্জলি
তরুর মর্মর আর পাখির কাকলি।

তারপর একদিন অকস্মাৎ প্রাবৃটের মায়া
দিগ্‌দিগন্তে মেলি দেয় ইন্দ্রজালচ্ছায়া,
অরণ্যে অঙ্কুর জাগে, পর্বতে নির্ঝর,
নদীতে তরঙ্গমালা, প্রান্তরের পর
নবশষ্পলেখা জাগে নবীন কবির
প্রথম প্রেমের গীতি,
বর্ষান্তের স্মৃতি
জাগে তৃণপুষ্পদলে,
তার তলে তলে
গুপ্তগতি ইন্দ্রগোপ কীট,
সঘন প্রাবৃট।

আকাশের আলিঙ্গনে নিশ্চল পৃথিবী,
মেঘের আড়ালে তার দিগন্তের নীবী
বহুক্ষণ অপসৃত,
বিচ্ছিন্ন লুণ্ঠিত
বিদ্যুতের সূত্রে গাঁথা অপরাজিতার
বরমাল্য তার।

পড়ে না পায়ের চিহ্ন
ঘনশষ্প মোর বনভূমে,
ভূঁইচাঁপা আঁখি খিন্ন
যেন যজ্ঞধূমে
বধূবেশী বৈদেহীর;
উর্বশীর
লাবণ্য নিক্ষেপ মুহু
মালতী কুসুমে;
যক্ষের আর্তির দূত নীলকান্ত মেঘ
নত হ'য়ে বনশ্রীরে শুধায় বারতা
দূর অলকার
ময়ূরের কণ্ঠে বন কয়ে ওঠে কথা,
মত্ত হাহাকার,
স্তব্ধতারে দীর্ণ করা কর্কশ ক্রেংকার।

আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়।
তাই আজ পউষের পড়ন্ত বেলায়
চিক্কণ বদরীগুচ্ছে চমকে আলোক,
ডুবে যায় চোখ
সুগভীর নীলে,
যতখানে যত ব্যথা আছিল নিখিলে
ঘুঘুর করুণ সুরে করিছে কাকলি;
খর্জুর বৃক্ষের গাত্রে পড়িতেছে স্খলি
সুরাগন্ধী রসবিন্দু ধরণীর সীধু;
আকাশের একপ্রান্তে গতপ্রাণ বিধু;
পর্বতের পরপারে অস্ত গেল রবি
নীলচ্ছবি
গিরিমালা নীলতর করি।
অরণ্যে একান্তে ব'সে আছে বিভাবরী।
আমি হেথা শুয়ে

তপ্ততৃণ ভুঁয়ে
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পুটে করিতেছি পান
বনশ্রীর দান
ক্লান্ত শিশুপ্রায়।
আমার এ বনস্থলী পূর্ণ কবিতায়॥

কবর

জসীমউদ্দীন

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ;
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল ব'লে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিত ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ী ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালী ঊষায় সোনামুখ তার আমার নয়ন ভরি
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও পথ ধরি।

যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত;
এ কথা লইয়া ভাবী-সা'ব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়ীতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
'আমাকে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।'

শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু'পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হ'ত না দেরী।

দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ীর বাটে!
হেস না হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশী হ'ত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, 'এতদিন পরে এলে,
পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে।'
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়!
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাদু, 'আয় খোদা দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।'

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি'
গণিয়া গণিয়া ভুল ক'রে গুনি সারাদিন-রাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি মাটিতে লাগায়ে বুক
আয়—আয় দাদু গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপ্‌জী ঘুমায়ে, এইখানে তোর মা,
কাঁদিছিস্ তুই? কি করিব দাদু পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর আসি ক'হল আমারে ডাকি,
বা-জান্, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।
ঘরের মেঝেতে সপ্‌টি বিছায়ে কহিলাম বাছা শোও,—
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে ব'য়ে,
তুমি যে কহিলা—বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?

তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে;
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিন-মান ভরি,
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝ'রে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভ'রে।
পথ দিয়ে যেত গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠখানি চাহি
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি'।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গোরস্থানেতে ব্যথিয়ে সকল গাঁ।

উদাসিনী সেই পল্লীবালার নয়নের জল বুঝি
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি'।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল,—'বাছারে, যাই,
বড় ব্যথা রো'লো দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার যাদুরে আমার লক্ষ্মী আমার ওরে;
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা, ছাড়িয়া যাইতে তোরে!'
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গন্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কি জানি আশীষ ক'রে গেল তোরে মরণ ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল—'আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার 'মাথাল' খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।'
সেই যে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়া মাণিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে প'ড়েছে গায়।

জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় ক'রে দয়া মাঙ দাদু, 'রহমান খোদা আয়,
ভেস্তে নাজেল করিও আজিকে আমার বাপে ও মায়!'

এইখানে তোর বুজীর কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু বাজীদের ঘরে বনিয়াদী ঘর পেয়ে।
এত আদরের বুজীরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত দাদু যেন কাল এসে,
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ীর দেশে।
শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে, ফোটাতে হেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি'।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ বীণ!
কি জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে;
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও, দাদু, ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো
কবরে তাহারে জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো,
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁদে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত-জোড় ক'রে দয়া মাঙ দাদু—'আয় খোদা দয়াময়,
আমার বুজীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু সাত বছরের মেয়ে
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা,

ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদীর ছবিখানি মোর হৃদয় রহিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
সাঁঝের আকাশ কালো করে দিত চারিটি চোখের ধারা।
একদিন গেনু গাজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলই তেমন আছে,
কি জানি সাপের দংশন খেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি'
দাদু ধর ধর বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি।
এইখানে, এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা ক'স্‌নাক জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ্‌ দেখি কঠিন মাটির তলে
দীন-দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে!

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ লাগে।
মসজিদ্‌ হতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর?
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, 'আয়্‌ খোদা রহমান,
ভেস্তে নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ!'

আমার পরান মুখর হয়েছে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে,
প্রভঞ্জনের প্রতি পদপাতে আমার পরান দোলে।

আমার পরানে ভাই,
কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই।
সূর্যের বুকে কী ভুখ জাগিছে আমার পরান জানে,
কীটের পাখার অস্ফুটতম বেদনা আমারে হানে।
আমার পরানে ভরা
এ পথচারিণী বসুন্ধরার অকারণ ঘুরে-মরা।
বনানী-বীণায় মর্মরি ওঠে আমার ব্যাকুল প্রাণ,
আমার পরান তৃণের সভাতে হয়েছে শ্যামায়মান।
আমার পরানে শিহরিছে প্রতি পুষ্পের ঝিলমিল্,
আমার পরান নিঙাড়ি নিঙাড়ি আকাশ হয়েছে নীল।
রহেনি কোথাও ফাঁক,
আমার পরানে জমেছে বিশ্ব-বেদনার মৌচাক।
দীর্ঘশ্বাসের দরিয়া দুলিছে, মরুভূর শূন্যতা,
অন্ধকারের কাতর কাকুতি, ঝরা মুকুলের ব্যথা—
আমার পরান ভরি
মূর্ছিত আছে যুগান্তরের মৃত্যুর বিভাবরী।

—

অভিসারিণী

রাধারাণী দেবী

পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখতে ঘিরে!
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবে নাক'—
অচল তুমি, পথ-চলা সুখ পাওনিক' তাই দাঁড়িয়ে থাক';
সৃষ্টি-করার আনন্দ কী বিপুলতরা,—
—উষর-মাটি শষ্পে ভরা!

অরণ্য গো, অরণ্য! হায়, ডাকছো মোরে,
লক্ষ-শাখার ব্যাকুল-বাহু প্রসার করে'!
বিধুর তোমার ছায়া আমার প'ড়ছে বুকে,—
মর্ম্মরিয়া দীন-মিনতি গুঞ্জরিছ' অবোল-মুখে।
থামার সময় নেইক' আমার;—তোমার দেহে
সবুজ করে' গেলাম স্নেহে।

উপল! ওগো উপল! তোমার শিকল-ডোরে
মিছাই সখা বাঁধতে প্রয়াস ক'রছো মোরে!
অচল হ'তে জন্মি' চলি অগাধ পানে,
সুনীল-আকাশ নীল সাগরের স্বপন দেছে জাগিয়ে প্রাণে!
রং ছুটায়ে ফুল ফুটায়ে চ'লছি ছুটে,—
মত্ত-গানের নৃত্যে লুটে'!

তটভূমি লো, তটভূমি! তোর প্রয়াস রাশি,—
চিত্তে আমার দ্বিগুণ জাগায় উছল হাসি।
বাঁধতে ব্যাকুল উভয়-বাহুর সীমার বেড়ে,—
তোর বাঁধনে পড়তে ধরা এলাম গিরি-ঘর কি ছেড়ে?
বিপুল-ভাঙন কখন্ কখন্ তাইতো আনি,—
বুঝিয়ে দিতে একটুখানি।

কুসুম লতা ক্ষেত তরু বন পাথর মাটী—
ডাক্ছে,—'নদি! থামলো, দিব পুলক বাটি!'
চলার নেশায় মাত্লো যেজন, হায় গো তারে··
এই ধরণীর অচল যা'রা—তা'রা কি কেউ বাঁধতে পারে?
বন্ধুরা সব! করতে হবে আমায় ক্ষমা,—
ধন্যবাদই রইলো জমা!

আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্র-রূপ,—
বাতাস দেছে পৌঁছে অতল-বার্তা অনূপ।
গান গেয়ে ঐ ডাক্‌ছে বিহগ,—'আয় লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপনা-সঁপে ঊর্মিলা হও স্বয়ম্বরা'—
ঢেউগুলি মোর ভব্‌ছে—'সাগর কখন্‌ পাবো;
যাবই, ওগো! যাবই যাবো।'

বেনামী বন্দর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়!
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

কূলহীন যত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়েব গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হয়রান লবেজান তরী
বরখাস্ত হল ভাই,
পাঁজরায় খেয়ে চিড়্‌;

মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
সেই-অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভীড়।

দুনিয়ায় কড়া চৌকিদারী যে ভাই
হুঁসিয়ার সদাগরী,
হালে যার পানি মিলে নাক' আর, তারে
যেতে হবে চুপি সরি।

কোমরের জোর কমে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধরে গেল কাঠে, আর যার
কল্‌জেটা গেল ফেটে,
জনমের মত জখম হ'ল যে যুঝে;
সওদাগরের জেটিতে জেটিতে
খাতাঞ্জি-খানা ঢুঁড়ে,
কোন দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাদের নাম পাবে নাক' খুঁজে।

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজেব ভীড়,—
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে;
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়,
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়।

মুখ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোস পরে হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন্ ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায়!
কার সে মুখ কার?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার!

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়,
ঝুমকোলতা দেয়াল তোলে, মরাই রাখে ভরে,
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরে-ই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব করে পুঁজি যা আছে ভাঁড়ায়।
তবুও কোন্ হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই করে রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার॥

———

কবিরা

অন্নদাশঙ্কর রায়

সকলেই যদি ভাঙনের তান্ডবে
স্বেচ্ছায় রত রবে
তবে
সৃজনের কাজ করবে কে আজ ভবে?

দেবতা কি শুধু মারেন মৃত্যুবাণই
রুদ্র পিনাকপাণি?
জানি
দূরে গিরিচূড়ে একাকী থাকেন ধ্যানী।

আমাদের কাছে বজ্রাঙ্কুশ নাই
সে কথা ভুলে না যাই।
ভাই,
আমরা যেন রে ধ্যানের সময় পাই।

চোখ গেলো

হেমচন্দ্র বাগচী

চোখ্ গেলো কা'র, কোন সে জনার,
কেমনে চিনিব তা'রে?
সে কি অশরীরী—আসে ধীরি ধীরি
মন-তটিনীর পারে।

সে কি বহি' আনে রূপ-সাগরের তীরে,
বিফল আশার বেদনা নয়ন-নীরে।
কোন্ ভাষা বলে বারে বারে, ফিরে ফিরে,
হৃদয়-কুঞ্জ-দ্বারে!
কেবা সেই জন—হারালো নয়ন,
কেমনে জানিব তা'রে?

মুহু কুহু-ভাষে; যে বিহগ আসে
মঞ্জু কুঞ্জ-তলে,
সে নহে এ জন· ইহার নয়ন
ভরিছে অশ্রুজলে।
যে আলো দেখেছে মেলিয়া নয়ন দু'টি
পক্ষ প্রসারি' দূর মেঘলোকে উঠি',
সে আলো রয়েছে প্রাণশতদলে ফুটি'—
ঝলকিছে পলে পলে!
আলোক-পিপাসী উঠেছিলো ভাসি'
জ্যোতি যেথা রহি' ঝলে!

তাই আজি হায়, ঝলসিয়া যায়
আঁখি দু'টি ধীরে ধীরে।
নাহি নাহি বারি—নির্মল ঝাবি:
তাইত কণ্ঠ চি'রে।
দূর গগনের সুদূর প্রান্ত হ'তে
ভাসি' আসে সুর বিপুল ব্যথার স্রোতে;
আঘাতি' ফিরিছে মানব-মানস-পথে;
জগতের মন্দিরে।
সে রূপ-আভায় আঁখি গেলো হায়,
তাইত কণ্ঠ চি'রে!

অরুণের মতো এযে অবিরত
আলোর বাসনা বহি'
উঠিলো আকাশে; কোন মহাভাসে
ফিরিলো নয়ন দহি'!
দুর্বল পাখা বুঝিবা মরণ-ডেরে;
শান্তি খুঁজিছে রূপ-পিপাসার ঘোরে!
বিপুল গগনে আকুল নয়ন লোরে
কাঁদি' উঠে রহি' রহি'।
নামে চোখে তা'র নিবিড় আঁধার।
লুপ্ত সুদূর মহী!

দিবস-প্রহর বাড়িছে প্রখর;
বাড়িছে দহন জ্বালা।
ক্লান্ত পথিক কোথা' কোন্ দিক
তোমার পান্থ-শালা!
রূপের তৃষার আশা কি মিটিলো শেষে!
কেন ফেরো আজি শ্যাম তরু-গিরি-দেশে!
পরবাসে বলো কে পরালো তোমা' হেসে
বিফল ব্যথার মালা!
হেরি আজি তাই, বিশ্রাম নাই
বহিছ বেদনা-ডালা!

চোখ গেলো যা'র, আজি সে জনার
সন্ধান দিলো আনি'
দীপ্ত দুপুর, দিবসের সুর,
ক্লান্ত ক্লিষ্ট বাণী!
সে নহে কেবল বিহগের ফিরে-আসা;
দাহ-তাপ-মাঝে ব্যথিত জনের ভাষা,
চির দিবসের সকল গরব-নাশা
সে যে বেদনার বাণী—

চোখ গেলো যা'র, সেই সে জনার
সন্ধান দিলো আনি'।

বারিহীন দেশে যেথা অবশেষে
মরুরেখা-পথ ধরি'
যাত্রীরা চলে ধীরে দলে দলে
মরুর তৃষায় মরি'।
সেই সে দেশের পাণ্ডু শূন্য তলে
যেথা অহরহ অসহ আলোক ঝলে,
তুমি কি বিহবো সেই সে দীপ্তানলে
তৃষায় বক্ষ ভরি?
যাত্রীরা হায় কেহ ফিরে নাই
মরু-রেখাপথ ধরি'!

সৃজন যেথায় শেষ হ'য়ে যায়
গগন-সীমায় দূরে,
অবিরত দাহে মন নাহি চাহে
যেথা যেতে;—সেথা উড়ে
তুমি গেলে চলি' তরুণ গরুড়-বেশে
দাবদাহ-মাঝে অমৃতের উদ্দেশে;
নয়ন হারায়ে আসিলে ফিরিয়া শেষে;
মর্তে মরিলে ঘুরে।
ফেরো বেদনায় তরুর ছায়ায়
চির-সকরুণ সুরে!

গেলো যা'র আঁখি নহে সে ত পাখী;
সে যে আশা, দেহহীন।
ভাসে তা'রি সুর চিরসুমধুর—
প্রতি প্রাণতললীন!

যে আশা পারে না সহিতে বেদনা-রাশি,
পারে না হেরিতে স্নেহ-দয়া-মায়া নাশি'
ধরণীর বুকে সুর উঠে তা'র ভাসি'
সকরুণ উদাসীন;
গেলো যা'র আঁখি, নহে সে ত পাখী,
সে যে আশা, দেহহীন!

আকবর

হুমায়ুন কবির

হে সম্রাট্, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে,
একান্ত বিজন।
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার ভেদি' ভেসে আসে
বিহগ-কূজন।

নীরব মধ্যাহ্ন-বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,
কেহ কোথা নাই;
অকস্মাৎ মর্মরিল তরুশাখে মন্থর পবন—
চমকিয়া চাই।

জীবনের গতি হেথা আসিযাছে মন্দ হ'য়ে ধীরে;
নাহিক স্পন্দন;
বন্দী হ'য়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন!

কত দিবসের ব্যথা, জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া;

স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দীর অন্ধকার-জাল
উঠে শিহরিয়া!

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কি মহা স্বপন!—
এ ভারত-ভূমি,
এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,—
বেঁধে দিবে তুমি!

সমাজ-আচার-ভেদ, ধর্মভেদ ভুলে যাবে সবে:
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন এক সাথে হবে
জীবন মরণ!

হায়! স্বপ্ন টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলা লাগি',
দেখি আঁখি মেলি'—
ক্রুর সর্পসম হিংসা হিয়া-তলে রহিয়াছে জাগি',
উঠিছে উদ্বেলি'।

বিদ্বেষ সমুদ্রসম আস্ফালিয়া করিছে গর্জন
ছাইয়া হৃদয়;
নীরব আকাশ-তলে প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন,
রক্তধারা বয়!

ধরণীর শ্যাম শোভা ক্লিন্ট আজি রক্তের ধারায়,
ভা'য়ের শোণিতে;
আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙ্গে যায়
সংগ্রাম-ধ্বনিতে!

স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি' পড়ে অহর্নিশ,
উঠে শূন্য-পানে

ক্রন্দন-গর্জন-রোল, অভিশাপ-হাহাকার মিশি',
কাহার সন্ধানে ?

তোমার সমাধি-পাশে বসি' আজি পড়ে মোর মনে
তোমার কীরিতি;
নিখিল ভারত ভরি' উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি!

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে;
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে!

হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার;
উঠুক মিলন-মন্ত্র সাম্যবাদ কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার!

হিংসা-দ্বেষ—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো—শঙ্কাভরে
হোক্ শান্ত হোক্;
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক!

রাঙা সন্ধ্যা

অজিত দত্ত

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে যায়।

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর—তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্ততা।

চলে যায় তারা চোখের আড়ালে, লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট, বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তারা কোন্‌খানে?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়ছে কি কোনদিন?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো যদি যাই সন্ধানে?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল, পাখার শব্দ ক্ষীণ।
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন ক্ষমাহীন॥

রাজা

অজিত দত্ত

জরি অর পুঁতি গাঁথা জমকালো চোগা-চাপকানে
জাঁদরেল চেহারায় পার্ট করে যাত্রার রাজা;
উষ্ণীষ-আভরণ সবি আছে আয়োজন যা-যা,
রাজসিক হবভাব, রাজকীয় চাল সবি জানে।
ভোর হলে এই সাজ ফিরে যাবে ভাড়ার দোকানে,
ঘরে আছে হেঁটো ধুতি, কড়া সাজা দু'ছিলিম গাঁজা,
হুকুমের জরু অছে আছে তাড়ি আর তেলেভাজা,—
আরেক রাজার পার্ট—ভাষাটা তফাৎ, একই মানে।

কিছু জেতে বীররসে, কিছু কিছু করুণ রসের
বিগলিত অভিনয়ে আসর-বাসর করে মাত,
জীবনের পালাগানে মেডেল-ইনাম নেয় জিতে,
কখনো নিজেরে ঢাকে নেশা দিয়ে কখনো জরিতে,
যত মিছে অভিনয় তত তার পাবার বরাত,
কেননা সে জেনে গেছে সিধে পথ দেশের-দশের॥

মুক্ত প্রেম

বুদ্ধদেব বসু

আমিও জানিনি, যতদিন ছিলে
আমারই স্বপ্নলোকে,
কত যে লিখন নিহিত তোমার
অতলান্তিক চোখে।
আজ তুমি এলে বেরিয়ে
স্বপ্নের সীমা পেরিয়ে।
রাত্রির্‌পার মাতৃজঠর
কেঁপে উঠে হ'লো দীর্ণ,
ছড়ালো আকাশে মুক্ত চাঁদের
অচিন্তনীয় চিহ্ন।

দুঃসাহসিক নাবিক সে-চাঁদ
স্বপ্নের তীর ছেড়ে
কেড়ে নিতে চায় অপ্রতিহত
অচ্ছোদ নীরবেরে।
শুভ্র প্রাণের তরণী
শঙ্খ-কোমল বরণী

চেতনার জলে উচ্ছল চলে
[illegible] সুদূর কোন অলক্ষ্যে,
তীব্র বিদ্যার-ফেনা দিয়ে যায়
[illegible] অসম্ভবের বক্ষে।

অবঞ্চনার বন্দনা-গান
জাগলো কলস্বরে,
মুখ তুলে-তুলে নক্র-মকর
দুই দিকে যায় স'রে।
মনের মগ্ন উতলে
ফেনার ঘূর্ণি উছলে,
সপ্ত রঙের আবর্তে মেশা
কত এষণার পঙ্ক
পার হ'য়ে যায় তরণী তোমার
নির্মল, নিঃশঙ্ক।

তারপর শুধু মহান মৌন
অকূল সিন্ধুজল,
ক্ষণসত্তার চিরবিস্তারে
মিলায় দণ্ড, পল।
কাল, আজও অনুপনীত,
গতির হাওয়ায় স্বর্ণিত,
দিগন্ত তার খুলে দেয় দ্বার
অভাবনীয় ভবিষ্যে,
ব্যক্তির বাঁধ ভেঙে নামে স্রোত
দায়িত্বহীন বিশ্বে।

যাত্রা তোমার কোনখানে শেষ
সে-কথা কেহ না জানে,
'ছেড়ে দাও, ওগো ছেড়ে দাও', শুধু
এই কথা আসে কানে।

তোমার প্রাণেরে জাগিয়ে
খানিক দিলাম এগিয়ে;
সীমান্ত পার, তোমার আমার
পথ হ'য়ে গেলো ভিন্ন।
অনাসক্তির শক্তি আসুক,
বন্ধন হোক ছিন্ন।

একদা তোমারে নিঃসীম প্রেমে
রচেছিলো যেই কবি,
তারই চোখে আমি দূর থেকে তবু
দেখে লবো তব ছবি।
তোমার সিন্ধু-মোহানা
আনে যে-সন্ধ্যা-অহনা,
তাই দিয়ে আজ সাজাক তোমাকে
তোমার সৃষ্টিকর্তা,
আমার প্রাপ্য আকাশে ব্যাপ্ত
তোমার বিশ্বসত্তা।

ইলিশ

বুদ্ধদেব বসু

আকাশে আষাঢ় এলো, বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।
মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল

আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস শর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

ঘোড়সওয়ার

বিষ্ণু দে

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?
নয়নে ঘনায় বারে-বারে ওঠাপড়া?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি?
হৃদয়ে আমার চড়া?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

হাল্‌কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হাল্‌কা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখো ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হাল্‌কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুসকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

সাত ভাই চম্পা

বিষ্ণু দে

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুল-রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!
বিরাট বাংলা দেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলা দেশ
কত না শাঙন রজনী পোয়ালো বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হে'ট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিলো সিংহলও।

তোমাকে খ‍ুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালী গানে, কপিলমুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গে আব কঙ্কণে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।

শ্যাম-কম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীল-কমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পাবুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেলো, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন হিরণমায়ায় রেখেছো ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই;
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ—

ঘোচাও চম্পা, দুঃস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ।
মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ॥

জন্মদিনে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সূর্যের সোনার নীড়ে
আলোর পাখীরা ফিরে যায়।
রাত্রি আসে।

রাত্রি এসে আমারে শুধায় :
"কী দিয়েছ পৃথিবীরে?"
কী দিয়েছি! দিইনি কিছুই।
বরং নিয়েছি তুমি যা রেখেছ পাশে—
সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, ভুঁইচাপা, জুঁই।

নক্ষত্রের আগুনের নীলে
তেমনি জিজ্ঞাসা :
"আকাশে কি দিলে?"
দিই নি। গিয়েছি ভুলে
হৃদয়ের ছিল কোন্ ভাষা—
মালা-গাঁথা হবে কোন্ ফুলে!

এক একটা শান্ত দিন

অরুণ মিত্র

এক একটা শান্ত দিন নিয়ে বিভোর হই
তাকে মৃদু নদী দিয়ে ঘিরে রাখি
কুয়াশায় মুড়ে রাখি
ভোর-ভোর আলো কিংবা গোধূলির গভীরে নিয়ে যাই
আমার জানাশোনা মানুষেরা স্তিমিত হয়ে হয়ে নিবে যায়
তাদের কথাগুলো হিম হয়ে থাকে
হিম শীতের রোদ আর ছায়া
কোন্ জলের শব্দ
নিস্তব্ধ মাঠ
মনের কপাট খুলে এই সব সংগ্রহ করি।

রাশি রাশি পাতায় আমার উঠোন ঢেকে যায়
রাশি রাশি ঘুম যেন ভর দেয়
সমস্ত চিন্তার উপর
পৃথিবী এক ছবি হয়ে থাকে চোখে
অপলকে তাকে দেখি যতক্ষণ পারা যায়
শুধু বুকের ঢিপঢিপ্টুকু
তাকে পুষে যেন বেঁচে থাকি ঘুমন্ত শিশুর মতো
আর সব দূরে পাখি
শীতের দিন ফেলে উষ্ণ আকাশের দিকে চলে গেল
তারা কি যেন বলে গেল
আহা আমার নিভৃত প্রাণ আমার গুঞ্জন আমার মুগ্ধ বিশ্বাস।

সন্ধ্যা নেমে এলে খেলাঘরে বাতি নেই
তখন হৃদয় জ্বালাতে ইচ্ছে করে মোমের মতো
শত সহস্র সন্ধ্যার ভিতরে এক নিবন্ত শিখা

তার চারি পাশে আদ্যিকালের গল্প
যার দিকে ফিরে মনের আগ্রহ
আস্তে আস্তে গলে গলে ঘুম হয়ে যায়।

এক একটা দিন এমন
সমস্ত তারের ঝনঝন যেন এক দীর্ঘ স্থির রেখা
সমস্ত বিক্ষোভ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
সমস্ত অশ্রু জমাট তুষার॥

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অজস্র নির্ঝর বেগে আনো শান্তিধারা
দগ্ধমাঠে, হে আষাঢ়,
কম্পিত বর্ষণছন্দে স্বপ্নে-গড়া মেঘের পাহাড়
ভাঙো নবধারাজলে,
হৃতশস্য-মৃত্তিকার বিশুষ্ক অঞ্চলে।
অমৃত বর্ষণে স্নাত রুক্ষ গ্রামে গ্রামে
জ্বালো স্বর্ণশস্যশিখা
অগণিত বঞ্চিতের কুটিরে কুটিরে,
কৃষাণের গানে গানে
ঋণমুক্ত সমবায়ে সাবলীল প্রাণ
আবার জাগাও মাঠে মাঠে।

হে আষাঢ়,
ভাঙো ভাঙো স্বপ্নময় মেঘের পাহাড়।
বিজলী আলোয় রাঙা মোহভাঙা মনে
মুখর বর্ষণে
আনো স্নিগ্ধ জীবনের শ্যামাঞ্জন মায়া।
জ্বালো দীপ
জ্বালো স্বর্ণদীপ
নৈরাশ্য-তিমিরে মগ্ন হৃদয়ের মৌন-তমসায়
মুছে দাও দুঃস্বপ্নের ছায়া
জাগাও প্রাণের কাব্য গানের বন্যায়।

কবি-গর্বে গরবিনী
দূর উজ্জয়িনী,
হে আষাঢ়, আজ মনে হয় :
অলস-মেদুরস্বপ্নে মেঘের পাহাড়
ছায়াশ্যাম জম্বুবনে,
সজল বিরহমৌন এ কবির উদাস নয়নে।
হে আষাঢ়, আজ মনে হয়
অতীতের উজ্জয়িনী স্মৃতির আলেয়া
এ জীবন-সিন্ধুকূলে কল্পনার স্বপ্নময় খেয়া।

জানি জানি হে আষাঢ়,
এ সমাজ এ জীবন রাজসভা নয়
নবরত্নে অলংকৃত
রূপবতী নটিনীর নূপুর-ঝংকৃত
শিপ্রাতটবিহারিণী তন্বীশ্যামা তরুণীবেষ্টিত
এ জীবন, রাজকবি কালিদাস নয়!

হে আষাঢ়,
ভাঙো ভাঙো দুঃস্বপ্নের মেঘের পাহাড়,
অজস্র নির্ঝরবেগে সারা বিশ্বময়

নবমন্ত্রে, গানে গানে, প্রাণে প্রাণে নবীন বিস্ময়
আনো প্রেমে, আনো স্বপ্নে, সচ্ছল উদার জীবনময়!
অগ্রগামী জীবনের যাত্রাপথে ঘুচাও সংশয়,
হে আষাঢ়!

ভাঙ্‌ল যখন দুপুরবেলার ঘুম

অশোকবিজয় রাহা

ভাঙ্‌ল যখন দুপুরবেলার ঘুম
পাহাড়-দেশের চারদিক নিঃঝুম.
বিকেলবেলার সোনালি রোদ হাসে
গাছে পাতায় ঘাসে।

হঠাৎ শুনি ছোট্ট একটি শিস,—
কানের কাছে কে করে ফিসফিস?
চম্‌কে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেখি,
এ কী!
পাশেই আমার জান্‌লাটাতে পরির শিশু দুটি
শিরীষগাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি।

অবাক কাণ্ড—আরে!
চারটি চোখে ঝিলিক খেলে একটু পাতার আড়ে!
তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুকরো দুটি
পিঠের 'পরে পাখার লুটোপুটি,
একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাসি—

কচি পাতার বাঁশি—
একটু পরেই পাতার ভিড়ে ধরছে মুঠি-মুঠি
রাংতা-আলোর বুটি।

এমন সময় কানে এলো পিটুল পাখির ডাক,
একটু গেলো ফাঁক,—
এক ঝলকে আবেক আকাশ চিড় খেয়ে যায় মনে
আরেক দিনের বনে,—
তারি ফাঁকে পাংলা রোদেব পর্দাটুকু ফুঁড়ে
এরাও গেলো উড়ে,
রইলো পড়ে ঝরা-পাতা, রইলো পড়ে ঢালু
পাহাড়-ধসা লাল গুহাটার হাঁ-করা ঐ তালু।

গৃহস্থ বাউল

জগদীশ ভট্টাচার্য

তোমার দেহলিপ্রান্তে কেঁদে কেঁদে কেঁদে
চলে গেল।
একবার ফিরে তাকালে না॥

প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে আজ।
তোমাদের তক্‌তকে নিকোনো উঠোনে
অদ্ভুত মানুষ এল ভিক্ষাঝুলি কাঁধে।
বয়স পঞ্চাশ পার,
গেরুয়া বসন,

শতছিন্ন আলখাল্লা তালি-দেওয়া রঙিন সুতোয়।
কোমরে উত্তরী কষে বাঁধা,
হাতে একতারা॥

কণ্ঠে তার সুর ছিল।
তোমার কিশোরীমনে দোলা দিয়ে গেল।
সেই থেকে শুনি প্রতিদিন
ভিখারিকণ্ঠের গান তোমাদের আঙিনার কোণে।
গৃহস্থ বাউল,
গান গেয়ে খুশি করে,
ভিক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরে যায়॥

তারপর কিছুদিন প্রবাসে ছিলাম।
প্রতিবেশিনীর কথা
বৈষয়িক কাজে-কর্মে ভুলেই গিয়েছি।
ফিরে এসে দেখি
দেউড়ির ধাপে বসে ভিখারি বাজায় একতারা।
অন্তরঙ্গ আলাপনে অনেক ঘনিষ্ঠ তার সুর।
কোনোদিন রাধাকৃষ্ণলীলা,
কোনোদিন শিবসংকীর্তন।
বাংলার লোকায়ত প্রাণপ্রবাহিণী
গঙ্গা-যমুনার স্রোতে
বাঙালীর পিপাসা মেটায়।
সেই স্রোতে ডুব দিয়ে বাউলের কণ্ঠে জাগে গান।

সংগীত-সমুদ্র হতে দুটি মূর্তি ভেসে ওঠে প্রাণে :
রাধা আর উমা।
বাংলার ঘরে ঘরে দুই নারী—দুটি স্নিগ্ধ নাম।
দুই নামে দুই রূপ, তবু যেন অপরূপ এক।
মানস-রাধাকে বুকে নিয়ে
শিব-উমা অর্ধনারীশ্বর॥

হঠাৎ অবাক হয়ে শুনি
ভিখারির কণ্ঠে ফোটে
তোমার নতুন নাম :
রাধারাণী।
বুঝলাম
সাহস বেড়েছে তার,
পেয়েছে প্রশ্রয়।
পল্লীবাসিনীর বুকে বাংলার শাশ্বতী কিশোরী
এসেছে বেরিয়ে।
হাতে তার পূর্ণপাত্র আমান্ন তণ্ডুল।
বাউলের ঝুলি ভরে মাধুকরী ভিক্ষার সুধায়॥

তারপর কেটে গেল আরো বহুদিন।
অসমবয়স্ক দুটি মানুষের খেলা
দেখে দেখে দেখে
কৌতূহল হল।
গেলাম মাঠের পারে
ভিখারির গাঁয়ে।
সাধারণ গৃহীর সংসার।
তবু তুচ্ছ নয়।
পুকুরের চার পাড়ে ফুলের বাগান।
টাটকা ফসলে ভরা সবজির ক্ষেত।
গোয়ালে ধবলী বাঁধা,
সদ্যোজাত বক্না বাছুর।
হাঁস-পায়রা
ছেলেপিলে
প্রৌঢ়া বহুড়ী।
নিতান্তই গৃহস্থ সে, নিম্নবিত্ত মানের মানুষ।
অথচ বাউল।

ঘরের খেয়েও তাই বনের পাখির ডাক শোনে,
খুঁজে ফেরে
কোথায় মিলবে তার মনের মানুষ॥

তোমার প্রশ্রয় পেয়ে স্পর্ধা তার ক্রমেই বেড়েছে :
রাধারাণী একদিন তাই হল রাধে।
রাধে ভিক্ষে দিলে তার পাত্র ওঠে ভরে।
নইলে কাঙালপনা কিছুতে ঘোচে না।
এদিকে তোমার চিত্ত দিনে দিনে হারায়েছ রঙ।
ভিখারির বাড়াবাড়ি অসহিষ্ণু করেছে তোমাকে।
প্রশ্রয় দিয়েছ বলে অভিমানে জেগেছে যন্ত্রণা॥

অবশেষে এল শেষদিন।
অন্নদামঙ্গল পালা ছিল তার সেদিনের গানের বিষয়।
ভিখারি মহেশ
কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে কৃপাপ্রার্থী রয়েছে দাঁড়িয়ে।
অন্নপূর্ণা বুভুক্ষা মেটাবে।
ঠাকুরসেবার কাজে সেদিন সারাটা বেলা তুমি ব্যস্ত ছিলে।
দেউড়ির ধাপে বসে ভিখারির গান শেষ হল।
তারপর প্রতীক্ষার পালা।
পূর্ণপাত্র হাতে নিয়ে দেখা দেবে তার রাধারাণী॥

তোমার সময় নেই;
গৃহদেবতার ভোগ পায়সান্ন চড়েছে উনোনে।
জুঁইকুঁড়ি বাসমতি চালের সুবাসে
আমোদিত হয়েছে আঙিনা।
ঘ্রাণলুব্ধ ভিখারি বাউল
বসে আছে দুরুদুরু দুরাশার দুর্লভ আশায়।
হঠাৎ তোমাকে দেখা গেল।

গৃহদেবতার ভোগ পূর্ণপাত্র পায়সান্ন নিয়ে
মন্দিরে যাবার পথে এসেছ বেরিয়ে।
ভিখারির কম্প্রকণ্ঠে শোনা গেল প্রার্থনার ভাষা :
'ভোগের প্রসাদ পাব রাধে?'

অকস্মাৎ কী যে ঘটে গেল!..
তড়িৎস্পৃষ্টের মতো দুটি চোখে ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে
একবাব ওর দিকে তাকালে আক্রোশে।
মুহূর্তে ফেরালে মুখ পরম ঘৃণায়।
পূর্ণপাত্র পায়সান্ন ছুঁড়ে ফেলে দিলে আস্তাকুঁড়ে॥

অন্ত্যজের লালসাদৃষ্টিতে
ইষ্টদেবতার ভোগ হয়েছে অশুচি॥

অবান্তর

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এখানে স্বর্গের চিন্তা বাতুল প্রয়াস;
বিদ্যুৎ-বর্শায় বিদ্ধ আমাদের হৃৎপিন্ডগুলি,
মন ম্রিয়মাণ। সর্বত্র আবহাওয়া ভারি
উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে। বেদনার দেনাশোধ
সে খুব সহজ নয়, নিরাসক্তি আরও কঠিন।
অপ্রমেয় মন্ত্রণায় দেশ ভাগাভাগি,
স্বার্থের বাণিজ্যে আসে বিপুল মুনাফা;
ফ্রয়েডীয় স্বপ্নের বিচার—
বাকি সব মানুষের যন্ত্রণা বিস্তার।

আবার ছড়াক তবু বাতাবীর ঘ্রাণ,
মধ্যাহ্নের বিন্দু বিন্দু রৌদ্রের নির্যাস;
ছিন্ন হোক্ মায়াজাল মিথ্যার কুহক,
পৌষলক্ষ্মী শহর সীমান্তে, উপকণ্ঠে
হাসি; নবান্নের বন্দনায় প্রান্তর মুখর।
দীঘার সমুদ্রকূলে সূর্যস্নানে ভিড়,
কিছুক্ষণ ভুলে থাকা সমস্যা জটিল;
আজ আছি কাল নেই—প্রশ্ন অবান্তর
মৃত্যু সে তো জীবনেরই নিত্য-সহচর।

কাস্তে

দিনেশ দাস

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

স্বর্ণভস্ম

দিনেশ দাস

ভস্ম তোমার ছড়িয়ে দিলেম
গঙ্গা সিন্ধু খরস্রোতে,
নীল, অ্যামাজন, হোয়াংহোতে
ছড়িয়ে দিলেম, ছড়িয়ে দিলেম
সাত সাগরের অতল জলেব অন্ধকারে,
নতুন প্রাণের অঙ্গীকারে।

এই যে বিরাট পতিত জমিন্ অনুর্বর,
মনসাকাঁটা-গুল্মভরা দিগন্তর,
শূন্য সকল সম্ভাবনা,
প্রাণহরণের প্রাণধারণের বিড়ম্বনা!

ভস্ম তোমার মিলিয়ে গেল স্রোতের তোড়ে
ননির চেয়ে নরম নতুন অবাক পলির সৃষ্টি ক'রে,
বসুন্ধরার বন্ধ্যাচরে

এবার বুঝি জীবন-সোনার ভস্ম ঝরে :
পতিত মাটি আজকে দেখি স্বপ্নরতা
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা,
দিগন্ত তার উঠবে জেগে
সবুজ মেঘে।

ভস্ম তোমার বীজের মতই ছড়িয়ে গেল আকাশতলে
জলেস্থলে।

আত্মরতি

পরমানন্দ সরস্বতী

কার চোখে যে কান্না ঝরে
কোথায় জ্বলে আগুন,
হঠাৎ ধরে কার মনে ক্ষয়
—ভীষণ রোগের ঘুণ,
কে কার খবর রাখে?
স্বার্থ-কাদার শীতল প্রলেপ
যে যার গায়ে মাখে।

মৌমাছি-সুখ চাক বাঁধে দূর
শূন্য আশার ডালে,
কঠিন দিনের দাহে পড়ে
চাকের মধু গলে—
মাটির হাঁড়ি কখন ভাঙে
হয় না মধু চাখা,

ধু-ধু করে মস্ত বড়
হাঁ-করা এক ফাঁকা।

ভাঙা-হাঁড়ির
কে-ই বা খবর রাখে?
চতুর মন কেবল ঘোরে
সুখের বাঁকে বাঁকে।
সুখের মুখ যায় না দেখা
সোনার দর্পণে,
সোনা-রূপা আগুন জ্বালে
আগুন জ্বালে মনে।

সবাই মরে বয়ে ভূতের বোঝা
কে কার খবর রাখে?
স্বার্থ-কাদার শীতল প্রলেপ
যে যার গায়ে মাখে॥

জ্যোৎস্না কাতর

সুশীল রায়

জ্যোৎস্না-কাতর আমি। ক্লান্ত আমি। এ-রাত্রে এখন
অসহ্য আলোর বন্যা বিছানা ও বালিশের কোণ
প্লাবনে দিয়েছে ভরে। চোখ-ভরা ঘুমের মৌতাত
ভেঙে দিল এই রাতে ওই চাঁদ, এ কী উৎপাত?
ঘড়িতে বারোটা বাজে। চুরি ক'রে এ শান্তির স্বাদ
ভীষণ বিরক্ত করে চাঁদ।

তালের চূড়ায় আর বটের জটায় ছিল জমা
অন্ধকারে-বঙ-করা রাত্রিটার সুন্দর সুষমা :
এই ছোট ঘর, এর দেয়ালে সিলিঙে মেজেটাতে
ছিল সে সুন্দর শান্তি। অকস্মাৎ এ কী জ্যোৎস্নাতে
ভরে গেল সারা ঘর? কেন এই হঠাৎ প্লাবন
ভেঙে দিল ঘুম, মন কেন ক'রে দিল উচাটন?

দুপুরে দেখেছি আজ অবিকল এমনি বিপদ--
শরতের পরিচ্ছন্ন মাজা-ঘষা নীলাকাশ, রোদ
সারা গায়ে মাখা তার : নীলে সুনির্মল সেই শোভা।
হঠাৎ সে নীল ভেঙে দেখা দিল সে-সদ্যবিধবা
--সাদা মেঘ, যেন থান-কাপড়ের প্রান্তে অঙ্গ ঢেকে
নীরব কান্নার চিহ্ন আকাশের গায়ে এঁকে-এঁকে।
বিষাদের সে-ছায়ায় দীর্ণ হল নীল, করুণায়
জলহীন আকাশের চোখে বুঝি জল এসে যায়।

এই-যে নিবিড় রাত্রি, এই-যে নিটোল অন্ধকার
আকুল জ্যোৎস্নার ঘায়ে এ-শান্তিও হল ছারখার।

পূবের জানালা দিয়ে চুপিসারে অন্ধকার ঘরে
চোরের মতন ঢোকে চাঁদ--এই রাত-দুপহরে।
সাদা চাদরেব সঙ্গে একাকার হয়ে যায় মিশে
মশারির ছাঁকনিতে ছাঁকা হয়ে বিছানা-বালিশে
পড়ে পরিষ্কার। এর অসহ্য এ শৌখিন মূর্তির
বিভায় ব্যাকুল করে, মন করে অস্থির-অস্থির।
কিছুতেই শান্তি নেই, গাঁন তাই একাই প্রমাদ।
ভীষণ বিরক্ত করে চাঁদ।

উঠে বসি, ত্রস্তহাতে বন্ধ করি জানালার পাট,
তবু এ কী? অন্ধকার তবু, কই, হয় না জমাট।

স্নিগ্ধ শরতের কৃষ্ণাপঞ্চমীর কোণভাঙা চাঁদ
কেন ওঠে এই রাতে—এই রাত বারোটা-নাগাদ।

মহুয়ার দেশ

সমর সেন

১

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।
অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

২

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

জোয়ার ভাটা

সমর সেন

১

যে জন বন্ধ ঘরে থাকে,
স্তব্ধ তার কাছে জীবনের জয়যাত্রা?
কূপমণ্ডূক, শোনে না সমুদ্রের গান,
কিন্তু সে তো দেখে কূপের উপরে
বৃত্তবদ্ধ নীল আকাশ,
দু-একটি অমর নক্ষত্র,
বৈশাখী মেঘের ভগ্নাংশ কোনোদিন।

২

একদা সহজ লীলায় পড়েছে দুরন্ত দানব,
আত্মস্থ রাখাল ফিরেছে আপন বাটে,
পাশে তার ধানের হরিৎ

মনে তার বর্ণচ্ছটা আদিম সূর্যের।
সেদিন সন্ধ্যায়
আমারো নির্জন ঘরে এসেছে দিগন্তের গান।

আজ সে-রাখাল কালের সারথি,
ধূর্ত কঠিন! রথচক্রে নির্বান্ধব প্রান্তর।
অন্ধঘরে বসে লোকক্ষয়ের দিনে
নিজের নাড়ীতে শুনি জরাব গান
সে-গান অস্পষ্ট ওঠে
যখন বৃষ্টিহীন কালোছায়া পড়ে উলঙ্গ প্রান্তরে,
যখন দক্ষিণমুখ বৃষভবাহন মহাদেব
হঠাৎ নিঃশ্বাসে হাওয়ায় দুঃসহ জ্বালা আনে।

৩

হেমন্তের প্রবীণ বিষণ্ণতা
দিনান্তের মাঠে: জনহীন গ্রামে
ভিটেতে ঘুঘু ডাকে;
চাষীরা পায়ে হেঁটে গেছে দূর দেশান্তরে
প্রাণের সন্ধানে নগরের প্রেতলোকে।
একটি গ্রাম্য কুকুর পড়ন্ত রোদে জল খুঁজে ধোঁকে,
একটি একেলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়,
প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখেনি সবুজ কলপ,
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশের সন্ধানে।

কুয়াশায় ছেয়েছে সমস্ত দিক,
জানি না বুড়ো বট কিসের প্রতীক!

ধুলো

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ধানের রঙের মতো হেমন্তের রৌদ্রভরা বিকেল
এতো আলো, এতো আকাশ, এতো প্রাণ
সবটা মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি ফলের মতো মনে হয়।
সবচেয়ে অবাক লাগে যখন মনে করি
আমি বেঁচে আছি, আমি দেখছি, আমি ভালোবাসছি।
অবাক লাগে ভাবতে : একদিন এদের আমি দেখিনি,
একদিন এদের আমি দেখবো না
এতো আলো, এতো আকাশ, এতো প্রাণ
ধানের রঙের মতো হেমন্তের রৌদ্রভরা বিকেল।

একদিন আমি এদের পাবো না
কিন্তু একদিন যে এদের পাবার আনন্দ
আমার মনের মধ্যে বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত হয়েছিল
তাদের রেখে গেলুম, ছড়িয়ে দিলুম
গ্রামের সোনালি ধুলোর পথে।
তামাটে পায়ের ফাটা-চামড়ার চাপ
এই আনন্দকে জীর্ণ করুক।
শিশু খেলা করুক এই ধুলোয়,
মাঠের ফসলের আর হেমন্তের শিশিরের গন্ধ
ছড়িয়ে পড়ুক এই সোনালি পৃথিবীতে—
বাংলা দেশের এই আশ্চর্য ধুলোয়।

হেমন্তের এই আলোর বন্যাময় শান্ত বাংলা দেশের গ্রাম
যত দূর দেখা যায় সোনার ফসল
মাঠের উপর স্তবের মতো নুয়ে পড়েছে
শান্ত নির্বাক সূর্যের উষ্ণ-কোমল স্পর্শ

একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইলো
বাঁশবন শিরশির করছে
একটা ফড়িং লাফিয়ে চোর-কাঁটার বনে অদৃশ্য হল
আকাশে শঙ্খচিল—
হঠাৎ দূরের মাঠ চিরে কালো মাল-গাড়ি চলে গেল

হেমন্তের পরিপূর্ণ পড়ন্ত বেলায়
কী নিরর্থক ভাবা :
একদিন ছিলুম,
একদিন থাকবো না।

ঘরের চাবি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

একটি ঘরের চাবি হাতে নিয়ে ঘুরেছি সর্বদা।
অথচ কোথাও সেই প্রাসাদের অবরুদ্ধ দ্বার
দেখছি না যেখানে পৌঁছই অনায়াসে
কবন্ধ ছায়াকে আমি ঠেলে ফেলে দিয়ে ফের
খুলবো উজ্জ্বল দ্বার যে কোনো নিমেষে।
একটি ঘরের চাবি হাতে নিয়ে ভালো ক'রে দেখি,
রাজপ্রাসাদের দ্বার খুলবো বলেই এতোকাল
এই চাবি নিয়ে আমি সন্তর্পণে গোপনে ঘুরেছি,
জনারণ্যে জনপদে যে-সময় দস্তুর চীৎকার।

একটি কবন্ধ ছায়া কেবলি আমার চারদিকে,
মনে হয় বাজপাখি তীব্র তার উজ্জ্বল নখরে

পায়রার বুক ছিঁড়ে একতাল মাংস নেবে বলে
সর্বদা প্রস্তুত থাকে পত্রশূন্য বৃক্ষের আড়ালে।
একটি পুরনো তালা কোথাও আবদ্ধ জর্জর,
খুললেই উন্মোচিত হ'তে পারে আলোক-সরণি,
ঝড়ের ঘূর্ণিত কেন্দ্রে চমকায় রক্তঝরা স্তর,
কখনো রৌদ্রের দিনে ওড়ে ক'টি মুগ্ধ প্রজাপতি।
চাবিটা হাতেই আছে কিন্তু সেই অলৌকিক তালা
পেলে তবে স্নিগ্ধ হবে ক্ষয়কারী দিনেব চেহারা।

চন্দ্রযুগে

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

দেহলিতে চন্দ্রযুগ। কবিতার কাঁপে রোমাবলী,
অঙ্গে অঙ্গে আলো নাচে, ত্রিভঙ্গে রাধার মত ঠাম,
কণ্ঠে শ্যাম বর্ণমালা, নামাবলী বাংলা পাণ্ডুলিপি,
চরণে উন্মনা হয়ে বৈষ্ণবী কবিতা আজ চলে
অভিসারে সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায়।

অশ্রুর ব্যঞ্জনা চোখে, মুখে নীল নিদর্শনা জ্যোতি,
দ্বারে এল চন্দ্রযুগ, তরুণীর ওষ্ঠে রসধ্বনি,
জ্যোতিষ্ক খুলেছে পথ আকাশের নিরক্ষরেখায়
কালপুরুষের কুঞ্জে কোথায় অনন্তনিমমূলে
অমৃতের সুগন্ধি ফোয়ারা?

চন্দনের ছায়াপথে তারাফুলে শ্যামলী কবিতা
চুল ঝাড়ে, ফুল পাড়ে, সপ্তর্ষির বাগানেতে নাচে,

আমি মর্তবাসী কিন্তু সে আমার রাগমালা নিয়ে
আকাশগম্বুজে ব'সে গান গায় বাংলা পদাবলী
চাঁদ সূর্য নক্ষত্রের কাছে।

এক মর্জির দুটি

হরপ্রসাদ মিত্র

এক

'আমি যে শিল্পী, আমার মধ্যে'—
কবি বললেন উদার গদ্যে :
আছে যে গভীর, সেই তো মান্যবর!
কারণ, বাইরে কত কিছু ঘটে,
কত-না আঁচড় জগতের পটে,
সব ফেলে যাই—
অমৃতেই নির্ভর!'

আমি বললুম : 'অমৃত কোথায়
ক্ষয়ে, ভাবনায়,—প্রেমের ক্ষুধায়?'
তিনি বললেন : 'সে তো বলবার নয়!'

তারপরে এক বিস্মিত যতি
চুকিয়ে গিয়েছে তর্কের মতি।
এখন যা আছে—
সে শুধু বস্তুভয়!

দুই
মিনার, গম্বুজ, বাড়ি, রুক্ষ লাল, ফ্যাকাশে সবুজ,
লোকারণ্য পার হয়ে আরো দূর নতুন রাস্তাতে—
পেঁছেই দেখলুম নদী,—সুখী মাঝি,--ছড়ানো আকাশ,
সজনে ফুলের মূর্তি,--মেথিবন,—বেগুনি কাঞ্চন,
মনের গানের মীড়ে ঝিরিঝিরি অড়রের ক্ষেত—
যেন সে স্বপ্নই, যেন কোনো এক বাসুদেবপুর!

তেমনি প্রশান্ত হোতো যদি সব প্রাপ্তি ও অভাব,
রাস্তার সমস্ত ভিড়, ঘরে ঘরে সমস্ত ছলনা--
ক্ষয়ে ভয়ে বঞ্চনায় রোগে শোকে প্রেমের ক্ষুধায়
যদি বুদ্ধি হোতো শান্ত সপ্তগ্রাম ছায়াব আরাম
অর্থাৎ নিসর্গভূমি হোতো যদি মানবজীবন--
তাহলে ফুটতুম ঠিকই প্রকৃতির সজনে-কাঞ্চন!

কিন্তু তা হয় না, আহা সে-কথাটা সকলেই জানে,
বাড়ি ফিরে মনে মনে বোঝা গেল সেই শাদা মানে।

একটি বিষণ্ণ বিকালে

গোপাল ভৌমিক

আশ্চর্য আনন্দে কেঁপে উঠলো হৃদয়
পড়ন্ত রোদ্দুরে; শীতের সকালে ছিল যত গ্লানি-ভয়
সব মুছে গিয়ে এই বিষণ্ণ বিকেলে
স্থির হল প্রাণসূর্য। দুটি চোখ মেলে

দূরে দেখি অত্যাসন্ন ভোর।
কিছু দূরে আলিসায় পাখা ঝাড়ে
শ্বেত কবুতর
সোনালী আলোকে;
জানিনা আছে কি জমা
ধান খোঁটা অবসাদ
পাখীর পালকে।

এমনও তো হতে পারে
এ শীতের পড়ন্ত রোদ্দুরে
দিনান্তের শেষ বাণী শোনে নি সে সন্ধ্যার নূপুরে
বরং সোনালী আলো
মেখে নিয়ে শ্বেত পুচ্ছে, ঠোঁটে
ভেবেছে ও দিন শুরু,
আঁধারের যবনিকা ওঠে।
কল্পিত ভোরের আলো
তাই সে মাখায়
দুধ স্বপ্নে মশগুল মসৃণ পাখায়
জনাকীর্ণ শহরের
জনহীন কোন এক স্তব্ধ আলিসায়।

যুক্তি বুদ্ধি দূরে ফেলে আমাদেরও মন
মাঝে মাঝে পাখীর মতন
সময়-সীমাকে করে তীব্র অস্বীকার।
দুটি ছোট চোখ, তার
রঙের বাহার
আশ্চর্য উদ্ভ্রান্ত করে,
স্বপ্নের শিশির ঝরে
রুক্ষ তীব্র বিদীর্ণ এ মাঠে,

হারানো পণ্যের নৌকা
অকস্মাৎ ফিরে আসে ঘাটে।

বিষণ্ণ বিকেলে এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
আনন্দের ধ্বনি বাজে
সোনালী নূপুরে :
স্থির হয়ে বসে থাকি তাই জানালায়,
দেখি শ্বেত কবুতর দূর আলিসায়
সোনা রোদ মেখে নেয়
প্রসারিত দুইটি ডানায়।

জীবাণু দেবতা

উমা দেবী

পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
কোন বিদেশের গোধূলিকায়
কোন দেবতার শেষ পূজায়?
নিঃশ্বাস-ধূমে আবিল করেছ শূন্যাকাশ
জীবন-মরুর মরীচিকা কাঁদে দুরাশ্বাস
তরঙ্গময় দিগ্‌বিদিক—
পন্থা তোর নিঃশেষ হ'লে ওগো পথিক
শেষ পূজা কোন গোধূলিকায়?
শেষ দেবতার কোন পূজায়?

সৃষ্টির নাম পরিবর্তন বলেছে কে?
এক দুই তিন লাল আর নীল হলুদ রঙের কারসাজি
মেঘে মেঘে রঙ বেগুনি সবুজ বাদামি গোলাপি সোনা খয়ের,
—সৃষ্টির নাম পরিবর্তন বলেছে ঠিক—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হ'লে ওগো পথিক
নূতনতর কি প্রাণোদ্দীপন গোধূলিকায়?

গোধূলিবেলার আমন্ত্রণের শুনেছি সুর
কুঞ্জবীথির ভ্রমর পুঞ্জ-গুঞ্জরণের কালো শিখায়,
জীবন-কাব্য-কাহিনী পড়েছি মমতা-মাখানো শত-লিখায়
কল্পনা-স্রোত তরঙ্গময় প্লাবিত করেছ দিগ্‌বিদিক—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হ'লে ওগো পথিক—

মিথ্যা প্রশ্ন—কালো আকাশের কালো হাওয়া বয় হিমশীতল,
শীতল স্পর্শ গায়ে এসে লাগে, চোখে এসে লাগে ঝাপটা তার,
কালো শয়তান অন্ধকারের শত-হীরা-জ্বলা তারার তাজ,
মুমূর্ষু চাঁদ অতি পাণ্ডুর কালো পোষাকের ছোঁয়া লেগে,
অদৃশ্য শত গুপ্তচরের সন্ধান ফেরে কালো হাওয়ায়,
ধরিত্রী-মাতা সভয়ে জাগে—
হৃৎপিণ্ডের অতিবিচিত্র সূক্ষ্ম সূত্রে জীবন দোলে,
—পন্থা তোমার নিঃশেষ হ'লে—

নিঃশেষ হ'লে? শেষ হ'তে আজো অনেক বাকি!
তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা এ যুগে এখনো হয়নি শেষ,
পূজা-বুভুক্ষু ক্ষুধিত দেবতা, দেবতার দল তৃষিত অতি,
হাওয়ায় সূক্ষ্ম জীবাণু ওড়ে,
জীবন-যজ্ঞে আহুতি দিয়েছি অস্থি মজ্জা মাংস ত্বক্—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
পাণ্ডুর-দ্যুতি গোধূলিকায়
কোন বুভুক্ষু দেব-পূজায়?

দেবতার পূজা? দেবতা-কাহিনী পড়েছি—তখন সত্যযুগ
মথনদণ্ড-মন্দারগিরি, রজ্জু হয়েছে বাসুকি সাপ,
ফণার সমুখে ধরেছে অসুর পুচ্ছ-প্রান্ত—দেবতা-দল,
উঠেছে অমৃত আর গরল—
গল্পের কথা গ্রন্থেই থাকে, জীবনে দেখেছ দেবতা কেউ?
আমরা দেখেছি—আমরা জেনেছি দেবতা ধরেছে জীবাণুরূপ!

জীবাণু-দেবতা! জীবন-দেবতা! তোমার প্রসাদ কামনা করি
বৈতরণীর বহমান স্রোতে প্রতীক্ষমাণ আমরা আজ-
স্বপ্নে সৃজন করেছি তোমার অতি-মোহময় সূক্ষ্মতনু
অকারণ ক্ষোভ-কঠিন-দণ্ড নিয়েছি আমরা অনভিযোগে
প্রসাদ পেয়েছি চকিতে কভু।

তিল তিল ক'রে সৃজিত দেহের সম্ভোগ-মধু-পুষ্পাসব
জীবন-পাত্রে তিলোত্তমার এনেছি নূতন আস্বাদন,
আকাশের নীল প্রলম্বমান খদির নেত্র-কনীনিকায়
হৃৎস্পন্দনে প্রতিধ্বনিত কালচক্রের চক্রতল,
শিথিল হস্তে এনেছি শেষের স্পর্শ-বেপথু নমস্কার
স্তিমিত নাসার আকিঞ্চন!
কালো আকাশের কালো হাওয়া বয় হিমশীতল,
শীতল স্পর্শ গায়ে এসে লাগে চোখে এসে লাগে ঝাপটা তার,
কালো শয়তান অন্ধকারের শত-হীরা-জ্বলা তারার তাজ,
মুমূর্ষু চাঁদ অতি পাণ্ডুর কালো পোযাকের ছোঁয়া লেগে,
অদৃশ্য শত গুপ্তচরের সন্ধান ফেরে কালো হাওয়ায়
হৃৎপিণ্ডের অতি বিচিত্র সূক্ষ্ম সূত্রে জীবন দোলে।

পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
কোন মোহময় গোধূলিকায়—
কোন দেবতার শেষ পূজায়?

স্রোত বয়ে যায় তীরে তীরে চলে পান্থ জন,
অপরিজ্ঞেয় অনন্ত-প্রাণ-নির্বাচন,
জ্যোতি-তরঙ্গ দিগ্‌বিদিক—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
দিবস-গলানো গোধূলিকায়—
কোন রাত্রির অসীমতায়?

রাজপুত্র

বাণী রায়

রাজপুত্র! রাজপুত্র! পক্ষিরাজ জানি
গেছে চলে বহুদিন তেপান্তর ধরে
সুদূর আকাশপ্রান্তে দিক্‌চক্রবাল,
অশ্বারোহী মিলিয়েছে কৃষ্ণবিন্দু যেন।

সে তো হল বহুদিন।
বহু ঊষা এল,
কাজল-আকাশে এল কত না প্রদোষ;
কত পুষ্প বিকশিল,
ভ্রমর গুঞ্জিল,
পক্ষিরাজ ফিরে আর এল না ধরায়।
রাজপুত্র, নিশা-অন্তে ব'লে স্বপ্নপ্রায়।

নই আমি রাজকন্যা,
তবু অনিমিখ
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি দিগন্তের সীমা,

ধুলো ওঠে ঝড় হয়ে, শুষ্ক পত্র খসে,
ধূসরে মিলিয়ে যায় সুদূর নীলিমা।
ওঠে না অশ্বের ধূলি শুধু চক্রবালে,
রাজপুত্র, এ নয়ন ঢাকে বাষ্পজালে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—
মৃত্যুর কোলে শিশুকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে-হলুদ-দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি !

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনো হাসছে॥

সান্ধ্য

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

একটু আগে হাওয়ার একটা হল্লা এসে
মারমুখো মেঘগুলোকে
তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

গঙ্গার ধারে গাছগুলো
কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল
বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা।

আর আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়ে
লাইনে পা টেনে টেনে
বুড়োর মতো কাশতে কাশতে চ'লে গেল
একটা মালগাড়ি।

আমরা ছেলেবেলার দুই বন্ধু
সাঁকোর ওপর থেকে ঝুঁকে প'ড়ে দেখছিলাম
দড়ির আগায় কী যেন বেঁধে
যারা কাঁকড়া ধরতে বসেছিল
আলো প'ড়ে এলে
খালি হাতে তারা উঠে চ'লে গেল।

জেটির গায়ে কিলবিল করছে
নোঙর-বাঁধা নৌকো।
ছইয়ের ভেতর লণ্ঠনগুলো জ্বলল।
একটা জ্বলন্ত কাগজ

হাত ছেড়ে দিয়ে
স্রোতের ওপর
বেশ খানিকক্ষণ মজা ক'রে ভাসল।

আমাদের নাকের ডগায় একটা জাহাজ

জলের ওপর থেবড়ে ব'সে
মেয়েদের মতো হাঁটুদুটো দু-পাশে এলিয়ে দিয়ে
কাঁটা হাতে
যেন বুনতে বসেছে।

তার
কোলের ওপর খেলা করছে
স্তব্ধতা।

একটা শান-বাঁধানো বেঞ্চিতে
আমরা অনেকক্ষণ
ব'সে থাকলাম।

জীবনটাকে চিনেবাদামের খোলায়
ছাড়াতে ছাড়াতে
যখন প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছি—
পেছনে পায়ের শব্দে
তাকালাম।

একটি ছেলে
আর একটি মেয়ে
বসবে ব'লে
উসখুস করছে।

ফেরবার তাড়া ছিল বলে
আমরা দু-জনেই
একই সঙ্গে উঠে পড়লাম।

তখনই চোখে পড়ল

নদীর ওপারে
রাস্তার আলোগুলো
অন্ধকারের গলায় সদ্য মালা পরিয়ে দিয়েছে।

শিল্পের ধমনী

মণীন্দ্র রায়

জন্মের চেয়েও মৃত্যু দয়াময়ী। কারণ মৃত্যুই
স্মৃতি, চলমান তৃষ্ণা, শরীরের পার ঘেঁষে ঘেঁষে।
এবং জীবন, সে তো প্রতিদিনই বিদেশ-বিভুঁই,
যদি-না সে অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় ভালোবেসে।

আমি তাই দুঃখ খুঁজি, যে আমার নিয়তির মতো
কেন্দ্রশায়ী চেতনায় বসে আছে স্তব্ধ অনালোকে।
অগ্নিহীন দীপে তার অঙ্গারিত বাসনার ক্ষত
বুঝিবা আমারই স্পর্শে জ্বলে শুধু শিখার ঝলকে।

জন্মে আমি কী পেয়েছি? জননী ও জায়ার হৃদয়—
স্তন্যের সুনিদ্রা আর বন্যতর ঘুমের আসব।
বরং মৃত্যুও ভালো; প্রতিদিন বাঁচার সময়
প্রতিটি মুহূর্ত যেন মৃত বলে করি অনুভব।

কারণ যা নেই তাই স্মৃতি, তাই স্বপ্নের পিপাসা;
এবং তৃষ্ণাই শান্তি, কারণ সে গতির সরণি।
অনেক মরণে মরে তবু যদি মেটে এই আশা—
আমিও বেতালসিদ্ধ ছুঁয়ে যাব শিল্পের ধমনী।

নচিকেত

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কেন ফিরে আসো বার-বার?
স্মৃতির তুষার থেকে কেঁদে এসে শীতের তুষার
কেন হেঁটে পার হতে চাও?
এমন নির্জন রাতে যেই ভয়ে নক্ষত্র উধাও
অনন্ত আকাশ থেকে, সে-নির্মম মেঘের কুয়াশা
কোন সুখে বুকে টানো? এ-নরকে কিসের প্রত্যাশা?

তুমি কি জানো না; যারা আসে
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে সূর্যহীন এ সৌর আকাশে
চারদিকের মৃত গ্রহদের
কবর, প্রস্তর ভেঙে আসে; তারা নিজেরি রক্তের
পিপাসায় জ্বলে। কোনখানে নেই একফোঁটা জল:
দীর্ঘশ্বাসে দ্বিখণ্ডিত এ-মাটির অশ্রুই সম্বল।

কেন তবে সব ভুলে যাও?
এ-প্রেতপুরীর বুকে মুখ রেখে কোন সুখ পাও?
আসমুদ্রহিমাচল এই মহাশূন্যের কান্নার

কেবল পশুর নখ দাগ কাটে; বিষাক্ত হাওয়ায়
সাপের খোলসগুলি ভাসে শুধু; আর
দিনরাত্রির বুকফাটা 'নেই, নেই, নেই'-এর চিৎকার।

সে চিৎকারে স্বর্গ-মর্ত্য টলে
পাথরও চৌচির হতো ভারতবর্ষের বন্ধ্যা পাথর না হলে।
জঠরের অসহ্য ক্ষুধায়
ধুমাবতী জন্মভূমি সন্তানের দুর্ভিক্ষের ভাত কেড়ে খায়,
এ-কী চিত্র! নরকের সীমা
চোখ অন্ধ করে দেয়, মুছে নেয় চেতনার সমস্ত নীলিমা।

তাই নিয়ে নচিকেতা, তবু তুমি গড়বে প্রতিমা?
অন্ধ হবে, বোবা ও অধীর
তবু ক্লান্তিহীন, মৃত্তিকায় পুনর্জন্মের অস্থির
জিজ্ঞাসায় মৃত্যুর তুষার
বারবার হেঁটে হবে পার?
অগ্নিদগ্ধ দুই হাতে কতবার খুলবে তুমি যমের দুয়ার?

জননী যন্ত্রণা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডুবাল দিন ঢেউয়েব ছেলেখেলা
সামনে—যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ায় হা-হা-হা-হা

পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা-টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পবে মূর্ছা বোন · ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেবেলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মতো এক কোণে বউ, দুয়রে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।
এক যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে ছেলে মা
ঘর যে তোমার ঘরে ঘবে, জননী যন্ত্রণা॥

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-দুকূল দুকূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমাব নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও-কাব নৌকো, আলো
নেই-মনিষ্যি 'তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?

সেই আমি সেই আমবা—আমবা কে মন্দ কে ভালো
কেউ মঠে কেউ ঘ'র কেউ-বা ক'লে কাবখানায।
একটি তারা-পিদিম কখন হাজাব তাবা জ্বালে:
এক ছেলে হাবালে—ছেলে এলাম হাজাব জনা
একটি আশা অনেক মুখেব পাপড়িতে মুখ মেলে:
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিবামেব মা আমার কানাইলালেব মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা॥

বিবর্ণ রুমাল

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

গাড়ী চলে গেলে উজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম থমথমে হয়,
জমকালো ভিড়, আর ফেরিঅলা পাৎলা হয়ে
কোথায় উধাও।

ট্রেনে তুলে দিতে এসে ফিরে যায় যারা
শুধু স্নিগ্ধ হাতের বলয়ে
রুমাল উড়িয়ে,
বিমর্ষ বিষণ্ণ এক নির্বোধ বিরহ
ব্যস্ত হয়ে হয়ে উচ্চকিত হয়।
যে যায়—সে যায়!
বুকের ভেতরে তার ট্রেনের দুর্দান্ত গতি
ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্
দূরের সংকেত পড়ে।
কিম্বা বিশ্রী ব্যস্ত হয়ে
বুকের ভেতর তার জন্ম নেয়
বিরহের বিষণ্ণ পুতুল।
রুমালের সাদা পদ্ম দিগন্তে মিলায়,
টুপটাপ টুপটাপ দল খসে,
ট্রেন চলে গেলে ধূসর মন্থর কোন্
নিস্তব্ধতা বুকের নদীর তীরে বিরহ কান্নায়!
যে যায়—সে যায়!

আমি এই ট্রেনে গেলে
তোমার রুমালে গড়া
পদ্মের সৌরভ হয়ে হাতের বলয়ে

দেখো আঁচরে মিলাবো।
ট্রেন চলে গেলে শুধু অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম,
বুকের পুতুলও মরে,
স্মৃতিতে ধূসর হয়
পদ্ম আর বিবর্ণ রুমাল!

মৌলিক নিষাদ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।
এই এক আশ্চর্য সময়।
যখন আশ্চর্য বলে কোনো-কিছু নেই।
যখন নদীতে জল আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।
যখন পাহাড়ে মেঘ আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।

পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে, আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোন-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে।

পিতামহ, আমি সেই দারুণ নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
মনে হয়, আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

কলকাতার যীশু

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল;
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট, টেম্পো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মত শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।

খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।

স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।

জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষ্‌টানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই;
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টাল্‌মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

এক বর্ষার বৃষ্টিতে

নরেশ গুহ

এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম
এত পথ হেঁটে, এত জল ঘেঁটে কী তবে পেলাম?

এত যে সয়েছি, এত যে পেয়েছি
দুঃখ-সুখের ধারায় নেয়েছি,
দুচোখে দেখেছি অপার্থিবের, অফুরন্তের ঝর্ণা,
প্রকৃতির রীতি, মানুষের ঘরকরনা :
মা'র কোলে শিশু ঘুমে অচেতন, চুলে বিলি দেয় হাওয়া,
একটি চুমোয় বিশ্বের সব খ্যাতি গৌরব বিত্তের স্বাদ পাওয়া,
ধিক্কারে ভরা নোংরা নরকে একটি কথার গানে
শতবার ফিরে জন্ম নেওয়ার অভিলাষ আনে প্রাণে।

সব আশা যদি চুরমার হয়, ভাঙে ফুলদানি, ভোরের চায়ের বাটি,
যে পথে সে আর ফিরিবে না, তবু আর একবার সেই পথ দিয়ে হাঁটি।
তৃষ্ণা মেটে না দেখে।
তবু শেষে জলে লিখে রেখে নাম
চলে যেতে হবে? কী তবে পেলাম, কী তবে হলাম?

চিরজীবীদের জয়টিকা আর অসামান্যের মাল্য
প্রতিজ্ঞা করে কেটেছে একদা দেবদুর্লভ বাল্য।
ছিল না শঙ্কা, মনের কোণায় সন্দেহ ক্ষীণ।
শিশু উল্লাসে হাওয়ায় হাওয়ায় সে আমার দিন—
রাঙা বুদ্বুদ—উড়িয়ে দিয়েছি চপল খেলায়।

আজ যৌবন খর জীবনের মধ্যবেলায়।

এখন দেখছি কত যে স্বপ্ন, কত যে ইচ্ছে
হোলো না জীবনে পূরণ, কে তার হিসাব নিচ্ছে?
চলতে চলতে নিজেই ভুলেছি—কত না দুপুর
কালো ভ্রমরের পাখায় এনেছে বহিয়া কী সুর!
লঘু প্রহরের সে সুর ছন্দে বাঁধার সময়
পেল না হৃদয়।

দীর্ঘ গ্রীষ্ম কেটে গেছে কত—গানের চরণ।
চোখের সামনে জারুলের শাখা বেগুনি বরণ
পুষ্প প্রদীপে অপব্যয়ের যে উদাহরণ
স্থাপন করেছে তা দেখে আমার হৃদয় জানতো
—আমারো তা হবে, জারুল শাখায় যে অফুরন্ত।
আমারো জীবন জারুলের মতো করবে তুচ্ছ
সকল চিহ্নঅবলেপকারী কালের ইচ্ছা।
আমিও পারব এ মরদেহের ধ্বংস ভুলতে,
হিমে উলঙ্গ কালের শাখায় পুচ্ছ তুলতে।

আমি তো কখনো করি নাই তাই কারো প্রতীক্ষা।
হায় দুরন্ত শ্রাবণ! তুমিই দিয়েছ শিক্ষা
হৃদয় শুধুই দুহাতে বিলাতে, ঝরাতে শুধুই।
তোমার মতোই সঞ্চয় আমি রাখিনি কিছুই।

আজ রাত্রিতে বৃষ্টি নেমেছে। একা বিছানায়
ঘুম চোখে নেই। শুয়ে শুনি হাওয়া ডেকে ডেকে যায়।
যেন মনে হয় এই রাত্রিতে এখানে আসার
কতকাল থেকে রক্তে আমার কথা ছিল কার।
আমাকে অমর করার মন্ত্র সে বুঝি জানতো।
সে অপার্থিব, সে অফুরন্ত।
সে যেন আমার লক্ষ্যবিহীন সকল গানের
অকূল মোহানা। সে যেন আমার অধীর প্রাণের
চির প্রতীক্ষা।
হায় দুরন্ত উতল শ্রাবণ, তোমার শিক্ষা
এই তো করল!
                    এবার কি তবে জলে লিখে নাম
চলে যেতে হবে? কী তবে পেলাম? কী তবে হলাম?

পার্ক স্ট্রীটের স্ট্যাচু

জগন্নাথ চক্রবর্তী

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে কে যেন ডাকল
আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম: "কোথায় যাচ্ছ?"
কিন্তু কাউকে দেখলাম না।

খুব জোরে ব্রেক কষলাম,
জুতোটা একটু ঘষলাম ক্লাচের ওপর—
না, কোথাও কেউ নেই।
আয়নার ভিতর পিছনে শেক্সপিঅর সরণি পর্যন্ত
পিচের রেখা ছাড়া কিচ্ছু নেই।
কিন্তু সিট ছেড়ে নেমে এলাম না,
আবার ধীরে ধীরে গিয়ার চড়ালাম।
কাউকে দেখলাম না,
শুধু নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম : "কোথায় যাচ্ছ?"

যাদুঘরের সাম্নে, কি যেন অসাড়
রাস্তা রোধ ক'রে পড়ে আছে।
আবার খুব জোরে ব্রেক কষলাম, পাছে—
না, তা নয়, দেওদারের দীর্ঘ ছায়া।
আবার যেন কে ডাকল
আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম : "কোথায় যাচ্ছ?"

এবার স্পীড বাড়ালাম
যতক্ষণ না অপসৃয়মাণ দুধার
ঝাপসা হতে হতে একেবারে ঘষাকাচ হয়ে গেল।
তারপর সেই ডাক আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল সারাদিন
পার্ক স্ট্রীট থেকে স্ট্র্যান্ড, স্ট্র্যান্ড থেকে বজবজ,
আবার স্ট্র্যান্ড, আবার এস্‌প্ল্যানেড, আবার যাদুঘর,
আবার খুব জোরে ব্রেক কষলাম।

কে যেন ডাকল।
"কে?" নিজের মনেই চীৎকার করে উঠলাম।
কেউ না।
স্টার্ট দিতে যাব এমন সময় দেখি—
এক বৃদ্ধ। খালি পা, হাতে একটা লাঠি,
ঠিক পার্ক স্ট্রীটের মাথায় স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে।

তারপর সারা বাংলাদেশ, সারা ভারতবর্ষ,
নোয়াখালি থেকে সবরমতী,
গাড়িতে, ট্রেনে, এরোপ্লেনে ছুটে বেড়িয়েছি,
আর ঐ স্ট্যাচুর মতো লোকটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে
আমার স্পীডোমিটারকে লজ্জা দিয়েছে,
তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে পথ থেকে পথে
পার্ক স্ট্রীট থেকে, বজবজ থেকে, কলকাতা থেকে, দিল্লি থেকে,
কাজে অকাজে ন্যায়-অন্যায়-নিয়ম-অনিয়মের এবড়োখেবড়ো পথে
ছুটতে ছুট্‌তে কেবলি শুনেছি : "কোথায় যাচ্ছ?"
আর কেবলি ব্রেক কষেছি।

সেই বৃদ্ধ, খালি পা, হাতে একটা লাঠি,
সর্বত্র স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে।

সত্যিই কোথায় যাচ্ছি?

একটা মজার লোক

রাম বসু

লোকটা মজার। তার প্রতি পদে কাঁটার শত্রুতা
কথা বলতে গেলে শব্দ জাদুমন্ত্রে রামধনু হয়
সে অবাক চেয়ে থাকে মোহমুগ্ধ প্রেমিকের মতো
যেন তার দাবী দাহ একটু নেই, নেই কোন ক্ষোভ।

হিতৈষী বন্ধুর পাল উদ্ধারের দায়িত্বে কঠিন
অবিরাম খোঁচা মারে, অবিরাম রক্ত ঝরে তার

সে এক খাঁচার পাখি গুলি করে মারার উল্লাস
সে তবুও বলে : রাত্রে পরী নাচে পাহাড়ের ধারে।

বলে আর রক্ত ঝরে, রক্ত ঝরে, বসে দ্যাখে একা
রক্ত তার বিকালের নদী হয়ে নক্ষত্রের দিকে
এখুনি শূন্যের মেঘ জলে নেমে সাঁতারে গোধূলি
ফোটার আগের ফুল বুকে তার নিপুণ ব্যথায়।

কাঁসার গড়ার মতো ঝক্‌ঝকে মেয়েদের দল
সর্বাঙ্গ নাচিয়ে বলে : তুমি নাকি মজার মানুষ?
লোকটা তখনো দেখে ভুঁই-চাঁপা পশ্চিম আকাশ
রূপের বর্শায় তার চোখ দুটো গলে যাবে যেন।

একদিন অন্ধ হলে, অন্ধকারে মৃত্যু হলে তার
ইঁদুর শেয়াল এলো, অবশিষ্ট মাংস পচে মাটি
হাড় কটা অকস্মাৎ পদ্ম হয়ে সেখানে বিভোর
মৌমাছি ভোমরার নাম-গানে মুখর নির্জন।

অলৌকিক আগুন

কৃষ্ণ ধর

দিগন্ত জোড়া এক আগুনে জ্বলছে অনাদি কালের পাহাড়
তার আদিম অস্তিত্বে আজ ভীষণতম উত্তাপ।
আমাদের স্থিত চিন্তা, আমাদের সংস্কার আর ক্ষুদ্রতাকে
প্রজ্বলিত করে জ্বলছে দাউ দাউ ভয়ংকর আগুন।

পিতামহদের দোহাই দিয়ে বলি, এখানেই তাঁরা পথ হাঁটতেন
জানি, এই পিতামহদের আমরা দেখিনি
যে-মন্ত্রের অর্থ কোনোদিন আমরা বুঝিনি
তার উচ্চারণে সর্বনাশকে ঠেকাতে চাই
আমাদের সামনে পিছনে, আমাদের সমগ্র অস্তিত্বে
আসন্ন পতনের সুনিশ্চিত পদধ্বনি।

আমাদের সুখ-অসুখ, আমাদের নিষিদ্ধ তৃষ্ণা
আগুন তার জিহ্বায় সমস্ত শুষে নিচ্ছে
আমাদের জীবন, আমাদের অব্যবহৃত প্রতীক
আমাদের উদ্দেশ্যহীন ভালবাসা
আমাদের নিরাময়হীন আজন্ম অসুখ
অলৌকিক আগুনের পবিত্র হৃদয়ের শুশ্রূষায়
শুদ্ধ হয়ে অন্য এক পৃথিবীকে দেখছে।

বাধা

সুশীলকুমার গুপ্ত

বেড়াটুকু পেরলেই নির্বাচিত তোমার সংসার।
পাখি গাছে দোল খায়, বাগানের মর্মরিত পথে
গোলাপের শোভাযাত্রা, কিছু দূরে স্থিতধী পাহাড়
একটি ঝর্ণাকে তার উপহার দিয়ে কোনো মতে
ভোলায় তোমার মন। একবুক সফল রোদ্দুরে
দাঁড়িয়ে হঠাৎ তুমি মেলে দাও শাড়ি, কুয়ো থেকে
জ্যোৎস্না তোল, শিশুদের কোলে নিয়ে স্মরণীয় সুরে
জীবনের গান গাও, রাত্রি হ'লে দাও ধীরে ঢেকে

উৎকণ্ঠ দৃশ্যের ক্লান্তি আঁধারের অমল ধারায়;
প্রকৃতির মতো তুমি শান্ত স্নিগ্ধ প্রীতিকরুণায়।

আমি শুয়ে শুয়ে দেখি।...শতাব্দীর স্বরচিত জ্বরে
পুড়ে যায় দেহমন, রক্তস্রোতে যান্ত্রিক জীবাণু
ছড়ায় ধ্বংসের বিষ রাত্রিদিন, বিপর্যস্ত ঘরে
স্মৃতির কঙ্কাল নাচে হাওয়ায় হাওয়ায়, ক্রূর ঝানু
ডাক্তারের ব্যবস্থায় শুধু রোগই বাড়ে।...যেই ভাবি
যাব শেষ শক্তি নিয়ে বেড়াটুকু পেরিয়ে ওধারে,
অমনি সংকেত-ঘণ্টা বেজে ওঠে ভৌতিক বেতারে,
নার্সের অভিজ্ঞ হাত টেনে এনে ঘরে দেয় চাবি।

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা;

তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।

মুদ্রণ প্রমাদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৯	১৬	কলমন্ত্রমুখরা	কলমন্দ্রমুখরা
১৮	৩	দুর্ণমিত	দুর্নমিত
৩৩	৫	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
৩৯	১২	স্বর্ণেরে	স্বর্গেরে
৩৯	২২	দলবৃন্ত	দল বৃন্ত
৪৮	শিরোনাম	ভীম সেন	ভীমসেন
৪৯	২৭	তবু ও	তবুও
১১২	১৬	পন্থা তোর	পন্থা তোমার
১১৪	১৬	খাঁদির	[illegible]াদির